KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, কলি-৬
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAR)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 2/2-3 3/1 3/2-3 3/4	Year of Publication : Oct-Dec 1977 July-Sep 1978 April 1979 Aug 1979
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মণীন্দ্র বক্সী (2/2-3) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

১০

কলকাতার ঠিকানা

ঠিকানাটা চেয়ে দেখি, নিচু পানে ওধারে
লেখা আছে 'কলিকাতা' – সে আবার কোথা রে!
স্মৃতি কয় 'কলিকাতা'? রোস দেখি; তাই তো,
কোথায় শুনেছি যেন, মনে ঠিক নাই তো!

বেগতিক শুধালেম সাধুরাম ধোপারে
সে কহিল, 'হলে হবে উশ্রীর ওপারে।'
ওপারের জেলে বুড়ো মাথা নেড়ে কয় সে,
'হেন নাম শুনি নাই আমার এ বয়সে।'

তারপরে পুছিলাম সরকারী মজুরে,
তামাম মুলুক সে তো বাংলায় হুজুরে।
ব্যোবাদ, বরাকর ইদিকে পচম্বা।
উদিকে পরেশনাথ, পাড়ি দাও লম্বা।
সব তার সড়গড় নেই কোনো ভুল তায়—
'কলিকাতা কাঁহা' বলি সেও মাথা চুলকায়।

অবশেষে নিরুপায় মাথা যায় ঘুলিয়ে,
'টাইম টেবল' খুলে দেখি চোখ বুলিয়ে!
সেথায় পাটনা, পুরী, গয়া, গোমো, মালদ
বজবজ, দমদম, হাওড়া ও শিয়ালদ।
ইত্যাদি কত নাম চেয়ে দেখি সামনেই,
তার মাঝে কোনোখানে কলিকাতা নাম নেই।

(সুকুমার রায় থেকে উদ্ধৃত)

এই গরঠিকানা শহরে সবসেরা ঠিকানা
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল
আধুনিকতম স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান
পঃ বঃ সরকার পরিচালিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত ১৯৯

সূচীপত্র

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিভাব : বর্ষা সংখ্যা ১৩৮৬

প্রবন্ধ

মা। মাতৃপূজা। বিনয় ঘোষ ১৭
সিলেব্‌ল-তত্ত্ব ও বাংলা ভাষার
সিলেবলের সংগঠন। পবিত্র সরকার ৩৩

কবিতাগুচ্ছ

কমল চক্রবর্তীর কবিতা। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫
কমল চক্রবর্তীর
আটটি কবিতা ৫৮

পুরাতনী

আচার্য লালবিহারী দে। রাধারমণ মিত্র ৬৪

কবিতাগুচ্ছ

রফিক আজাদের কবিতা। তারাপদ রায় ৮৪
রফিক আজাদের
পাঁচটি কবিতা ৮৬

চিঠিপত্র

রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০
আদিনাথ ভট্টাচার্য ৯২

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার।

প্রদীপ দাশগুপ্ত।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস।
কলিকাতা-৭০০০১৭

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রোসেস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং রাজধানী প্রেস ১১৭।১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২ ও 'স্বপলেখা' ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে আমরা যে আশংকা প্রকাশ করেছিলাম গত সংখ্যায়, মাত্র তিনমাসের মধ্যে তা সত্যে পরিণত হয়েছে। তবে এই ভাঙাগড়া দল বদলের খেলাকে কেন্দ্র করে নোংরামীর যে প্রদর্শনী ঘটে গেল এবং এখনো আদর্শহীন নেতাদের গোপন বেচাকেনার যে মহলা চলছে তা সারা পৃথিবীর চোখে আমাদের করুণার পাত্র করে তুলেছে।

ভাবতে অবাক লাগে এই দেশপ্রেমবর্জিত নেতারা মূলত দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখন গদির জন্য এ হেন গর্হিত কাজ নেই যা তারা করছেন না। এরা প্রায় ভুলেই গেছেন কয়েকশো এম পি ছাড়াও দেশে আরো ষাট কোটি মানুষও আছেন, তারা কিন্তু এইসব অসৎ নেতাদের স্থির লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। দুদিন আগে হোক পরে হোক নির্বাচন হবেই। গরীব দেশের আরো কিছু অর্থ নষ্ট হবে। গোপন টাকার খেলায় এদেরই কয়েকজন দেশকে নতুন করে জাহান্নামে পাঠাতে পার্লামেণ্টে ফিরে এলেও আসতে পারেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা কি প্রতিবাদহীন তা শুধু দেখেই যাবো। আবার সেই কমিটি, সাবকমিটি, কমিশনে ভরে উঠবে দেশ। সর্বাত্মক বিপ্লব দূরে থাক, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিমণ্ডলে গণতন্ত্রের সামান্য চরিত্র-লক্ষণও থাকবে অনুপস্থিত ?

আমাদের উপজীব্য রাজনীতি নয়, সাহিত্য। কিন্তু যে দিকে তাকাই সাহিত্য, শিল্প, সর্বপ্রকার সারস্বতপ্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে উঠছে হীনমন্যতার রাজনীতি। যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবি ভাবেন, দেশের চরিত্র ও বিবেকগঠনের দায়িত্ব যারা তাদের বুদ্ধিজীবিকাসূত্রে পেয়ে গেছেন বলে মনে করেন, তাদের ভূমিকা তো আরো শোকাবহ। ডাকিনীতন্ত্রসৃষ্ট এমারজেন্সীর সূচনাকাল থেকে সেই যে কুম্ভকবৃত্তি সুরু হয়েছে বুদ্ধিজীবিদের, আজও তা শেষ হলো না। দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম

ছাড়া রাজনীতি নিয়ে এই নীতিহীন জন্তু উন্মাদনার কোনো সংগঠিত নির্ভীক প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবিরা এখনো করে উঠতে পারেননি! বলা বাহুল্য, আমরা নিজেদেরও এর অন্তর্গত ভেবেই এ আত্মসমালোচনা লিখছি।

এবার বিভাবের নিজের কথা একটু বলি। আমাদের বহুঘোষিত "দিলীপ গুপ্ত" সংখ্যার কাজ পুরোদমে সুরু হয়েছে। তবে প্রকাশিত হবে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এমনিতে আজকাল আর কালোবাজারী দাম ছাড়া কাগজ পাওয়া যায়না। অন্যান্য খরচও বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। এসব ছাড়াও কিছু কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণঅযোগ্য কারণে প্রকাশকাল আবার একটু পেছিয়ে দিতে হলো। অক্টোবরে একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে এর প্রকাশ উৎসব উদ্‌যাপন করবো আমরা। কাগজে তা যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হবে। গ্রাহকদের কথা ভেবে এ সংখ্যাটি তাই সাধারণ সংখ্যা হিসাবেই প্রকাশিত হলো।

আরেকটি কথা, আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সাল থেকে বিভাবের উদ্যোগে দিলীপকুমার গুপ্তর স্মৃতিতে "দিলীপ গুপ্ত পুরস্কার" নামে একটি পুরস্কার প্রতি-বছর দেওয়া হবে। পুরস্কারটি পাবেন বছরের সেই সেরা লিটল ম্যাগাজিনটি, যার লেখা, মুদ্রণসৌকর্য্য, উপস্থাপনশৈলী ও সামগ্রিক মান আমাদের বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলীর বিচারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে। এর অর্থমূল্যের পরিমান ও অন্যান্য ঘোষণা বিভাবের বিশেষ "দিলীপ গুপ্ত" সংখ্যায় থাকবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রবন্ধ

মা। মাতৃপূজা

বিনয় ঘোষ

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশিনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥

—অথর্ববেদ, 'পৃথিবী-সুক্ত' ১২।১।৬

"মা হলেন পৃথিবী। এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা বসুন্ধরা সুবর্ণবক্ষা এবং যা কিছু চলমান তাদের নিবেশিনী। এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে, ইন্দ্র তার ঋষভ। এই ভূমি আমাদের সম্পদ দান করুক। এই ভূমি আমাদের দুগ্ধ দান করুক, ভাস্বর করে তুলুক। মা যেমন পুত্রকে দুগ্ধ দান করেন, সেইভাবে পৃথিবী আমাদের দুগ্ধ দান করুক। আমি পৃথিবীর সন্তান। তোমার যে গন্ধ পুষ্করে প্রবেশ করেছে, অমর্ত্যগণ প্রথমে যে গন্ধ গ্রহণ করেছিল, হে পৃথিবী, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুবাসিত কর, আমাদের কেউ যেন হিংসা না করে। এই পৃথিবীতে শিলা আছে, মাটি আছে, পাথর আছে, ধুলো আছে, সুবর্ণবক্ষা সেই পৃথিবীকে নমস্কার করি। হে পৃথিবী, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা, তোমার শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, তোমার দিনরাত্রি, এরা সকলেই যেন আমাদের উপর রস বর্ষণ করে। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে যে সভা, যে সমাবেশ, আমরা সে সম্বন্ধে চারুবাক্যই বলব। যা কিছু দেখব তাই আমার চিত্ত জয় করবে। হে মাতা পৃথিবি, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সঙ্গে আমাকে শ্রী এবং সম্পদ দান কর।"

অথর্ববেদের মধ্যে পৃথিবীর এই যে সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তির অপূর্ব

বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই ভাবধারাই আমাদের দেশের হিন্দুধর্মের মধ্যে, এবং সাহিত্যের মধ্যেও অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। তাই পৃথিবী হলেন মা এবং মাতৃপূজা আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে মাটির খুব কাছাকাছি মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। মা যে কেবল প্রাণদায়িনী অন্নদা মঙ্গলময়ী ঐশ্বর্যদায়িনী এবং গতির প্রতিমূর্তি তাই নন, মৃত্যুর পরেও তিনি মৃতের শেষ আশ্রয়দাতা। ঋগ্‌বেদে একাধিক মন্ত্রে মৃতকে জননী-পৃথিবীকেই আশ্রয় করতে বলা হয়েছে। জননী-পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে, মায়ের মতো সস্নেহে তিনি যেন মৃতকে সন্তানের মতো রক্ষা করেন। মন্ত্রে বলা হয়েছে—"হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর কাছে গমন কর। ইনি সর্বব্যাপিনী, সুন্দর সুশ্রী। হে জননী-পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করে রাখ, একে পীড়া দিও না। হে পৃথিবী, এই মৃতকে উত্তম-উত্তম সামগ্রী ও প্রলোভন দাও। মা যেমন নিজের আঁচল দিয়ে পুত্রকে আচ্ছাদন করে রাখেন, তেমনি তুমি এই মৃতকে আচ্ছাদন করে রেখ।"

জন্মের সময় মা। জীবনে চলার পথে মা। মৃত্যুর পরেও মা। তাই মাতৃপূজা সকলশ্রেণীর মানুষের কাছে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, নানাবিধ প্রত্যয় ও প্রতীকের ভিতর দিয়ে, বিচিত্ররূপে প্রচলিত।

জনক মানে যদি জন্মদাতা হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে একথা জেনে রাখা উচিত যে, জনক ছাড়াই কেবল জননী একাই জীবন সৃষ্টি করতে পারেন, অর্থাৎ জীবের জন্ম দিতে পারেন। একথা জীববিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা বলেন। "In many higher forms reproduction is effected by the female alone parthenogenetically" (Briffault).[১] যেমন wheel-animalcules, crustaceans, saw-flies, caddis-flies, gall flies, অনেকরকমের moth ও প্রজাপতি প্রভৃতি জীবের ক্ষেত্রে পুরুষের যৌনভূমিকা ছাড়াই প্রজনন সম্ভব হয়। তাছাড়া, আদিম মানুষের লক্ষ লক্ষ বছরের শিকারী জীবনের কথা যদি ভাবা যায়, তাহলে মানুষের জীবনে নারীর ভূমিকার প্রাধান্য ও গুরুত্ব পরিষ্কার বোঝা যায়। আদিম শিকারী-সমাজে যদিও মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকত এবং মধ্যে-মধ্যে হয়ত পুরুষদের সঙ্গে শিকারযাত্রারও সঙ্গী হত, তাহলেও শিশুদের প্রতিপালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে তাদের উপরেই থাকত তাতে

১. Robert Briffault: The Mothers (Abridged), London 1959, Ch. 2

কোনো সন্দেহ নেই। যে-কোনো স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় মানবশিশুর শৈশব সবচেয়ে বেশি দীর্ঘস্থায়ী। সেইজন্য মানুষের মাতৃনির্ভরতাও অন্যান্য জীবের তুলনায় অনেক বেশি। আদিম সমাজে যাযাবর শিকারী-জীবনে 'পরিবার' যেহেতু স্থায়ী ও বিশেষ স্থানকেন্দ্রিক সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠেনি, তাই জনক পিতার ভূমিকাও তখন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি, এমনকি পিতা সন্তানদের কাছে অজানা ও অজ্ঞাত থাকাও অসম্ভব নয়। কাজেই মানবসভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী আদিকালে অন্তত মাতৃরূপী নারীর ভূমিকাই প্রধান ছিল দেখা যায়। এইরকম সামাজিক পরিবেশে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আদিশক্তিরূপে মাতৃপূজার প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিচিত্র সম্ভার থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ববিদ্ জেমস (E O James) তাঁর মাতৃদেবীপূজার ইতিহাস-গ্রন্থে, এবং অন্যান্য গ্রন্থেও এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২] জেমস বলেছেন

> female figurines, commonly called 'Venuses', in bone, ivory, stone and bas-relief, often with the maternal organs grossly exaggerated, were introduced into Eastern and Central Europe at the beginning of the Upper Palaeolithic by an Asiatic migration in what is now known as the Gravettian culture......

আদিপ্রস্তরযুগের খাদ্যসংগ্রহের পর্বে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়, ভেনাসের মতো নারীমূর্তি মাতৃদেবীরূপে পূজিত হয়। এই মূর্তিগুলির 'maternal organs' বেশ সুপরিস্ফুট এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লাল রঙে রঞ্জিত। লাল রঙ হল রক্তের প্রতীক, রক্ত হল জীবনের প্রতীক, তাই জীবনের সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য মাতৃমূর্তির বিশিষ্ট অঙ্গগুলিকে লাল রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হত। নারীর বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সুপরিস্ফুট করার মধ্যে প্রজননশক্তির ইঙ্গিত স্পষ্ট। এশিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে হাড়ের পাথরের পোড়া-মাটির এরকম প্রচুর মাতৃমূর্তি প্রত্নতত্ত্ববিদরা

২. E. O. James: The Cult of the Mother-Goddess—an Archaeological and Documentary Study: London 1959. এবিষয়ে তাঁর Prehistoric Religion, The Beginnings of Religion প্রভৃতি গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

আদিপ্রস্তরযুগ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন যে, পুরুষদেবতার পূজার আগে থেকে মানুষের মধ্যে নারীকে জীবনদাত্রী দেবীরূপে পূজা প্রচলিত হয়েছে। জেমস তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন

> Women being the mother of the race, she was essentially the life-producer and in that capacity she played the essential role in the production of offspring. Nevertheless, as agriculture and herding became the established modes of maintaining the food-supply, the two poles of creative energy, the one female and receptive, the other male and begettive could hardly fail to be recognized and given their respective symbolic significance.

চাষবাস করে ফসল ফলানোর আগে পর্যন্ত জীবের জন্মপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে মানুষের কোনো সঠিক ধারণা ছিল না এবং তা না থাকাই স্বাভাবিক। জন্মের ব্যাপারটা তাদের কাছে রহস্যময় ছিল, বিশেষ করে জনকরূপে পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে তাদের কোনো সম্যক ধারণা ছিল না। সেইজন্য যিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করেন, সন্তান প্রসব করেন এবং সেই সন্তানকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করেন, সেই মা যে জীবের উৎপত্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তা মানুষের চেতনায় সর্বপ্রথম আকাশের তারার মতো ফুটে উঠেছিল। তাই মানুষের কাছে মা হলেন আদিদেবী। মা সৃষ্টি করেন, মা জীবন প্রতিপালন করেন, মা বিনাশ করেন এবং মৃতকেও পুনরুজ্জীবিত করেন।

অনেকে অনুমান করেন, মাতৃদেবীপূজার পরে পুরুষ-দেবতার পূজার প্রচলন হয়েছে, বিশেষ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার পরে। কৃষিসমাজের উদ্ভবের পর পিতৃতন্ত্রের বিকাশ হয় এবং তখন থেকেই পুরুষ দেবতারূপে পূজ্য হয়। নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে যাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন, তাঁদের যুক্তি সকলে যে গ্রহণযোগ্য মনে করেন তা নয়। জেমস অবশ্য পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন (পূর্বোক্ত গ্রন্থে)

> Mixed farming, however, in which agriculture and domestication were combined in the maintenance of food-supply, seems to have produced in due course the growing consciousness of the duality of male and female in the generative process. It was then that the Young God, embodied in men and the bull became the son and consort of the Goddess in the seasonal drama. Nevertheless, while mother-earth retained her status and significance, and continued to reign supreme as the mountain-mother from western Asia to Minoan Crete, it was in their dual capacities, that they usually appeared when the cult in its developed form was dispersed from its area of characterization through Cappadocia to the Eastern Mediterranean, and across the Iranian plateau and Baluchistan to India.

জেমস-এর মতে, চাষবাস ও পশুপালনের সঙ্গে প্রজননক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। আমাদের মনে হয়, চাষের চাইতেও পশুপালনের সঙ্গে এই সম্পর্ক আরও গভীর। জন্মের সঙ্গে পুরুষ-নারীর যুগ্ম-ভূমিকার সম্পর্ক প্রকট হবার পর মাতৃদেবীর পুত্র অথবা পতিসঙ্গীরূপে পুরুষ-দেবতার আবির্ভাব হতে থাকে এবং ক্রমে তার প্রসার ব্যাপক হয়। তৎসত্ত্বেও মাতৃদেবীর প্রাধান্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভারতবর্ষে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় প্রচুর মাতৃমূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলি দেবীমূর্তি বলে মার্শাল, ম্যাকে, হুইলার প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু শিবের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে শিব ও শক্তিরূপা মাতৃদেবীর পূজার প্রাধান্য অন্যান্য দেবদেবীর তুলনায় আদৌ কমেনি। আজ পর্যন্ত এই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। শিবের বিভিন্ন রূপের মধ্যে লিঙ্গমূর্তিই (Phallic) প্রধান এবং যোনিসহ লিঙ্গমূর্তির সংখ্যাও কম নয়, হয়ত বেশি। এই মূর্তির মধ্যে প্রজননক্রিয়ার রহস্য সম্পূর্ণ উন্মোচিত। সৃষ্টির প্রতিমূর্তিও একে বলা যায়, 'generative process'-এর প্রতীক মাতৃদেবীর প্রাধান্যও উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতে সুবিদিত, বাংলা দেশে তো বটেই।

'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে বিভিন্ন জেলায় নানারূপে মাতৃদেবীর পূজাচার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। যেমন বর্ধমান

জেলায় অমরাগড়ের শিবাক্ষাদেবী, মানকরের পঞ্চকালী বড়কালী, ঢেকুরের শ্যামারূপা, অম্বিকা-কালনার সিদ্ধেশ্বরী কালী, দেগুড়ের বিক্রমচণ্ডী, ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাদেবী, উজানি কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডী, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা, দামুন্যার (ছোট বৈনান) চণ্ডীদেবী; বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরের মহিষমর্দিনী, নলহাটির কালিকা, আকালীপুরের গুহ্যকালী, তারাপীঠের তারা; বাঁকুড়া জেলায় ছাতনার বাসলীদেবী, সোনামুখীর স্বর্ণদেবী; মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের বর্গভীমাদেবী, ঝাড়গ্রামের সাবিত্রীদেবী, চিলকিগড়ের কনকদুর্গা ও রঙ্কিণীদেবী, শিলদার রঙ্কিণী, গড়বেতার সর্বমঙ্গলা, বরদার বিশালাক্ষী, নারায়ণগড়ের ব্রহ্মাণী, কাঁথির লক্ষেশ্বরী, শাঁকরাইলের জয়চণ্ডী; হাওড়া জেলায় রাজবলহাটের রাজবল্লভী জয়পুরের জয়চণ্ডী, আমতা ও মাকড়দহের চণ্ডী; হুগলী জেলায় গুপ্তিপাড়ার দেশকালী, সোমড়ার জগদ্ধাত্রীদেবী, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী, শেওড়াফুলির নিস্তারিণী কালী, সিঙ্গুরের বিশালাক্ষী; মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী; নদীয়া জেলায় নবদ্বীপের পোড়া-মা, রাসপূর্ণিমায় বিচিত্র শাক্তদেবীর উৎসব, উলার চণ্ডীদেবী এবং চব্বিশ-পরগনা জেলায় ত্রিপুরাসুন্দরী কালী প্রভৃতি। এছাড়া আরও অনেক দেবীর বিবরণ আছে, বিশেষ করে শাক্তদেবীর। গ্রাম্য লোকদেবীর বৈচিত্র্যের তো অন্ত নেই। শীতলা মনসা বুড়িমা চণ্ডী ষষ্ঠী প্রভৃতি লোকদেবীর মধ্যে চণ্ডী মনসা শীতলার অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী-প্রধান অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবী নানারকমের আছে। তার বিবরণও যথাসম্ভব আমরা দিয়েছি। সেখানেও দেখা যায় শক্তিরূপী দেবীর সংখ্যা কম নয়। বাংলা দেশে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, সাধারণ জনস্তরে দেবীর, এবং দেবীর মধ্যে কালীর প্রতিপত্তি অন্য যে-কোনো পুরুষ গণদেবতার তুলনায় অনেক ব্যাপক। বাঙালীর মনপ্রাণ থেকে দেবীর সম্বোধনে 'মা' কথাটাই যেন স্বতঃই উৎসারিত হয়, নাম ধরে সাধারণত কোনো দেবীকে কেউ ডাকে না। যেন সকল দেবীরই 'মা' সম্বোধনটাই প্রাপ্য। তিনি কালীই হন, দুর্গাই হন, আর চণ্ডী চামুণ্ডা শীতলা মনসা যেই হন। সকলেই মা। সর্বজনপ্রিয় গণদেবতা শিবের চেয়েও মনে হয় যেন শক্তিরূপী মাতৃদেবী আরও অনেক বেশি জনহৃদয়কে জয় করেছেন।

শক্তিপূজা ও তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্য বাংলা দেশে বহুকালের প্রাচীন। এর উৎস যে আদিমজাতির সংস্কৃতি থেকে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাগার্য

সংস্কৃতির ধারা শক্তিপূজা ও তন্ত্রসাধনার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। হিন্দু সংস্কৃতি বৌদ্ধসংস্কৃতি সবকিছুর মধ্যেই শক্তি ও তন্ত্রের প্রভাব নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে তার বিস্তারিত ইতিহাস প্রাসঙ্গিক নয় বলে আলোচ্য নয়। এখানে আমরা প্রধানত বাংলার ও বাঙালীর শক্তিসাধনার কথাই সংক্ষেপে বলব।

উপনিষদে দেখা যায়, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁরই দীপ্তি নিয়ে অন্যান্য দেবগণ পরে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু শাক্তধর্মের একটি ধারায় দেখা যায়, দেবী হলেন ব্রহ্মস্বরূপিণী। তিনি শুধু জগতের অধীশ্বরী নন অথবা জীবগণেরও অধীশ্বরী নন, সমস্ত দেবদেবীর অধীশ্বরী। তিনি পরমেশ্বরী। শক্তি শিবাশ্রিতা বা পরাশ্রিতা নন, তিনি স্বাশ্রয়া স্বতন্ত্র। 'চণ্ডী'তে আমরা দেখতে পাই, দেবীর জ্যোতি থেকে অন্যান্য দেবদেবীর উৎপত্তি। 'চণ্ডী'তে তাঁকে বলা হয়েছে 'সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী', অর্থাৎ সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। নিশুম্ভের মৃত্যুর পর শুম্ভ যখন দেবীকে বলেছিল 'মানিনী তুমি অন্যান্য দেবীগণের শক্তি আশ্রয় করেই যুদ্ধ করেছ। তোমার নিজের শক্তি কোথায়?' দেবী তার উত্তরে দীপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

'জগতে আমি একাই, আমার পরে দ্বিতীয়া কে আছে? এই দেবীগণ সকলেই তো আমারই বিভূতিমাত্র – হে দুষ্ট দেখ, সেই আমার বিভূতিসকল আমার মধ্যে প্রবেশ করছে।' এই এক এবং অদ্বিতীয়া দেবীর সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শক্তিকে আশ্রয় করেই মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই ত্রিদেবীর বিকাশ হয়েছে। বাংলা দেশে যেমন চণ্ডীর প্রাধান্য, তেমনি কালীর, অর্থাৎ শাক্ত ভাবধারাই প্রবল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে অষ্টপ্রহর কীর্তনাদির কোলাহলে মনে হয় বটে যে, বঙ্গসমাজ বৈষ্ণবভাবাচ্ছন্ন, তৎসত্ত্বেও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তার পাশাপাশি চণ্ডী-কালী ইত্যাদির শাক্ত উপাসনার ঐতিহ্যমূল অনেক বেশি গভীর। অবশ্য বৈষ্ণবভাবাচ্ছন্নতা ও মচ্ছব-কীর্তনাদির প্রাবল্যের সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় বলবীর্যপৌরুষের ক্রমক্ষীয়মাণতার সম্পর্ক কতখানি তাও বিচার্য বিষয়। আমাদের ধারণা, সম্পর্ক অনেকখানি, প্রত্যক্ষ ও নিবিড়।

চণ্ডীর কথা বলি। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রায় প্রত্যেক

সাহিত্যেই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী' অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তো হয়েছেই। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ রচিত 'চণ্ডী-চরিত্র' বিশেষ উল্লেখ্য। পাঞ্জাবী ও হিন্দীতে লিখিত গুরু গোবিন্দ সিংহের 'চণ্ডী-চরিত্র' দেখা যায়। গুরু গোবিন্দ শিখ হলেও চণ্ডীভক্ত ছিলেন, কারণ তিনি পৌরুষ-বলবীর্যের সাধক-উপাসক, অর্থাৎ প্রকৃত শক্তির উপাসক। খড়্গকে তিনি 'ভগৌতী' বা ভগবতী আখ্যা দিয়েছিলেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'-র ভূমিকায় চণ্ডীকাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে উজ্জয়িনী অথবা বাংলা দেশকে এই চণ্ডী কাহিনীর উৎপত্তিস্থল বলেছেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের চণ্ডীগীতিতে দেখা যায়, চণ্ডী হলেন উজ্জয়িনীর রাজকন্যা। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর রাজকন্যা চণ্ডী স্বহস্তে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। নারী হলেও চণ্ডীর শৌর্যবীর্যের খুব খ্যাতি ছিল। একদিন চণ্ডী নদীতীরে তর্পণের জন্য যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, অসুরগণ তাঁকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছে, তাই তিনি তাঁর কাছে সাহায্য চান। চণ্ডী ইন্দ্রের প্রতি সদয় হয়ে, বাঘের পিঠে চড়ে, তাঁর সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অসুরদের নিধন করেন।

প্রশ্ন হল, উজ্জয়িনীর রাজকন্যা এই চণ্ডীর কাহিনী কী করে গড়ে উঠল? শোনা যায়, মহারাষ্ট্রে এবং গুজরাটের জুনাগড়ে যে দেবী আছেন তিনি ব্যাঘ্র-বাহনা এবং একজনের নামও 'বাঘেশ্বরী'। বাংলা দেশে শক্তিপূজার ইতিহাসে দেখা যায় যে, একদিকে অসুরনাশিনী চণ্ডীর ধারা এবং অন্যদিকে পার্বতী উমার ধারার মিলন-মিশ্রণ হয়েছে। শক্তির এই মিশ্ররূপ আমরা পুরাণ উপপুরাণ তন্ত্রাদিতে দেখতে পাই। কিন্তু আরও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই দুটি ধারার সঙ্গে (অর্থাৎ দুর্গা ও চণ্ডীর ধারা) তৃতীয় একটি ধারা এসে মিলিত হয়েছে বাংলার শক্তিপূজার সঙ্গে। এই তৃতীয় ধারাটি হল কালিকা বা কালীর ধারা। বাংলা দেশে, বিশেষ করে শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে, কালীই সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছে। বাংলা শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্যের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ ও প্রাচীন। কীভাবে এই শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে দুর্গা চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর ধারাকে প্লাবিত করে কালীর ধারা প্রাধান্য পেল তা জানা দরকার। অনেকে মনে করেন বেদের রাত্রিসূক্তের ধারাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে এক রাত্রিদেবীর বিকাশ হয়েছে এবং এই রাত্রিদেবীই ধীরে ধীরে কালিকার রূপ ধারণ করেছে। বৈদিক সাহিত্যে 'কালী' নামটি প্রথম পাওয়া যায় মুণ্ডক উপনিষদে। সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বার

একটি জিহ্বা। প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থানে কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত বীরদের হত্যা করেছিলেন, তখন সেই বীরগণ তাঁদের দৃষ্টিপথে ভয়ঙ্করী কালীকে দেখতে পেয়েছিলেন। এমন হতে পারে যে, মহাভারতের এই কালীর কাহিনী পরবর্তীকালের যোজনা। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে উমা-মহাদেবের বিবাহের বরযাত্রার যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায়, কৈলাসের মাতৃকাগণ যাঁরা মহাদেবের অনুগমন করছিলেন, তাঁদের সকলের পশ্চাতে ছিলেন কালী, নীলমেঘরাজির মতো শোভা বিস্তার করে। বোঝা যায়, কালী কালিদাসের কালে অন্তত ভয়ঙ্করী শক্তিদেবী বলে গণ্য ছিলেন না। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী কালীর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁর প্রাধান্য কোথাও স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মে দেবদেবীদের মর্যাদার সোপান-বিন্যাসে কালিকা-দেবীকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়নি। 'খিল হরিবংশে' মন্তমাংস-প্রিয়া এক দেবীকে শবর বর্বর ও পুলিন্দগণ নিয়মিত পূজার্চনা করে বলা হয়েছে। 'কাদম্বরী'তে শবরগণ যেভাবে বনের মধ্যে রক্তের বন্যায় চণ্ডীর পূজা করছে দেখা যায় এবং চণ্ডীর পূজারী বৃদ্ধ শবরের যে ভয়াবহ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে শবরপূজিতা রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চণ্ডীর প্রতি কবির অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে বলতে হয়। অষ্টম শতকে বাক্‌পতিরাজ তাঁর 'গউরবহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপূজিতা পর্ণশবরীর (পর্ণ বা পত্রপরিহিতা শবরদের দেবী বলে নাম 'পর্ণশবরী') উল্লেখ করেছেন। ভবভূতি-রচিত (সম্ভবত সপ্তম শতকে) 'মালতীমাধব' নাটকে আমরা নরবলিদানে পূজিতা ভয়ঙ্করী 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভয়ঙ্করী 'চামুণ্ডা' দেবী। বন-জঙ্গলের কাছে শ্মশানঘাটের পাশে এঁর মন্দির এবং ইনি কৃষ্ণবর্ণা ও উগ্রা। এই চামুণ্ডাই আমাদের কালিকা দেবী বা কালী। মনে হয় একদা চামুণ্ডা ও কালী ভিন্ন দেবী ছিলেন, পরে রূপসাদৃশ্যে ও সাধর্ম্যে অভিন্ন হয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে পৃথকভাবে অবশ্য চামুণ্ডা দেবী ও কালীর পূজা হয়। একাধিক স্থানে (যেমন বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বরে) চামুণ্ডার পূজা হয়। চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে নিয়ে কালী চণ্ডিকার কাছে গিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাস্যের সঙ্গে বলেন—'এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি-চণ্ড-মুণ্ড দুই মহাপশু তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি স্বয়ং শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করবে।' দেবী চণ্ডিকা তখন কালীকে বলেন—'যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে ছিন্ন

শির নিয়ে আমার কাছে এসেছ সেই কারণে তুমি লোকের কাছে চামুণ্ডা বলে পরিচিত হবে।[৩]

সে যাই হোক মূল প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি। চণ্ডী-কালী-চামুণ্ডাদি শক্তিদেবীদের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করলে নিষাদ শবর বর্বর পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য আদিবাসীদের ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাতৃপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে একথা আমরা আগে বলেছি। বাংলা তথা ভারতের ক্ষেত্রেও মাতৃপূজার এই প্রাগৈতিহাসিক অতিপ্রাচীনতা একটি বড় সত্য। ভারতের, এবং বাংলা দেশেরও, নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস এই সত্য সমর্থন করে। সংক্ষেপে বলা যায়, মা জীবনের প্রতীক, রক্ত জীবনের প্রতীক, তাই চণ্ডীকালী চামুণ্ডা তারা প্রভৃতি শক্তিদেবীর পূজানুষ্ঠানের সঙ্গে রক্তের প্রত্যক্ষ সংযোগ নিবিড়, এবং এই রক্তের জন্যই বলিদানের ব্যবস্থা, পশুবলি বা নরবলি যাই হোক। বাংলা দেশের ইদানীং শক্তিপূজায় যদিও বলিদানের প্রথা বৈষ্ণবী ও বারোয়ারী প্রভাবের ফলে ক্রমেই অপ্রচলিত হয়ে আসছে, তাহলেও শাক্ত পীঠস্থানে, কালীঘাট থেকে তারাপীঠ কোথাও, মাতৃপূজায় বলিদানের ধারা একটুও ম্লান হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মাতৃপূজার স্থানে, শতাধিক বছর আগেও, নরবলির প্রচলন ছিল। প্রাচীন পত্রিকাতে মধ্যে-মধ্যে তার বিবরণও পাওয়া যায়। এখন অবশ্য বেআইনী বলে নরবলির প্রচলন স্বভাবতঃই কোথাও নেই। কিন্তু তবু শাক্ত পীঠপ্রধান বীরভূম জেলায় অনেক গ্রাম পর্যটনের সময় প্রাচীন কালীর স্থানে কোথাও নরবলির গুজব আমরা শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, গুজব সবক্ষেত্রে মিথ্যা নয়।

এবার আমরা বাংলা দেশে কালীর প্রাধান্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে, সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে কালী যে আধুনিক ভাষায় সত্যকার 'গণতান্ত্রিক' দেবী, এবং কালীই যে masses-এর, অর্থাৎ প্রাকৃত জনগণের অফুরন্ত শক্তির প্রতিমূর্তি, সেই বিষয়ে কিছু বলব। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে যতটা জানা যায় তাতে মনে হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলা দেশে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে-পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা করি, তার প্রচলন হয়েছে সম্ভবত ষোড়শ শতক থেকে। বিংশ শতকে পঞ্চাশোত্তর কালে, ইদানীং যে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান আমরা

৩ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : কলিকাতা ১৩৬৭
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা।
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : তন্ত্রকথা : বিশ্বভারতী ১৩৬২

দেখতে পাই, তার গোড়াপত্তন হয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালী হিন্দু রাজা-মহারাজা ও বড়-বড় বাবুদের জাঁকজমকসহ দুর্গোৎসবের প্রচলন বর্তমানে বিশেষ নেই। বর্তমান উৎসবের বাহ্য বাহারবৈচিত্র্য বেড়েছে এবং তার সঙ্গে মূর্তি ও সাজসজ্জায় কিছু বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ববোধের মিশ্রণ ঘটেছে। ফলশ্রুতি অঢেল অর্থের অপব্যয় এবং যে দেশে সংকট-সমস্যার অন্ত নেই সেই দেশে, পরমাশ্চর্য ব্যাপার হল, এই অপব্যয় সম্বন্ধে সর্বশ্রেণীর লোকজন একেবারে বেহুঁস। কিন্তু সে অন্য কথা।

দুর্গাপূজার পরে বর্তমানে আমরা যে কালীপূজা করি তার প্রবর্তন হয়েছে, যদিও কালীকে কেন্দ্র করে আসল যে-শক্তির প্রত্যয় তার মূল মানবসমাজের আদি-কালের দিগন্ত পর্যন্ত প্রসৃত। দশমহাবিদ্যার সকলেই শাক্তদের উপাস্য দেবী, যেমন কালী তারা ষোড়শী (ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা) ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্ন-মস্তা ধূমাবতী বগলামুখী মাতঙ্গী ও কমলা। বাংলা দেশে এই দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রধান উপাস্য হলেন কালী তারা ষোড়শী দুর্গা। বগলা ছিন্নমস্তা প্রভৃতি মহাবিদ্যার পূজা আভিচারিক কাজে, অর্থাৎ মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রচলিত। সর্বজনীন কল্যাণার্থে এঁদের পূজা করা হয় না এবং পূজার সময় মূর্তি নির্মাণের রীতিও প্রচলিত নয়। মহাবিদ্যাগণ ছাড়া একমাত্র চণ্ডীর পূজা বাংলায় অত্যধিক প্রচলিত।

কালীর বিভিন্ন রূপের বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্রসাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন ভদ্রকালী গুহ্যকালী শ্মশানকালী শ্বেতকালী প্রভৃতি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানের বা অঞ্চলের নাম দিয়ে কালীর নাম হয়েছে, যেমন ঢাকেশ্বরী যশোরেশ্বরী প্রভৃতি। সিদ্ধেশ্বরী করুণাময়ী আনন্দময়ী চিত্তেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি নানারকমের নামে কালীর পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নানাস্থানে এইসমস্ত শাক্ত দেবীর মন্দির আছে এবং সেখানে নিত্যপূজা ও উৎসব হয়। তার বিবরণ এই গ্রন্থের তিনটি খণ্ডের অনেকস্থানের আলোচনাপ্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

তন্ত্রসাহিত্যে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানারকমের দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়। কালীর এই শিবারূঢ়া মূর্তি নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। যেমন সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব; তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব; নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে মহাবলরূপিণী শক্তি দেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এবিষয়ে প্রাচীন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া। অসুরনিধনের পর তিনি অসুরগণের শব পদদলিত

করেছিলেন, তাই শবারূঢ়া দক্ষিণাকালীর প্রচলিত ধ্যানেও দেখা যায়—'শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাম'। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, তিনি মহাকাল, সকল প্রাণীকে কলন বা গ্রাস করেন তাই তিনি আদ্যা পরম কালিকা। কালকেও গ্রাস করেন তাই দেবীর নাম কালী, কেউ বলেন আদ্যাকালী। কালীতন্ত্রের কালীর এই বর্ণনাই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসারে' কালীর ধ্যানরূপে গৃহীত হয়েছে। বাংলা দেশে যে কালীমূর্তির পূজা করা হয়ে থাকে তিনি করালবদনা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা দক্ষিণা দিব্যা মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বামদিকের উপরের হাতে খড়্গ, নিচের হাতে ছিন্নমুণ্ড; ডানদিকের উপরের হাতে বর, নিচের হাতে অভয়। দেবী মেঘের মতো শ্যামবর্ণা এবং দিগম্বরী। কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা থেকে ক্ষরিত রক্তের ধারায় দেহ চর্চিত। দুটি শবশিশু তাঁর কর্ণভূষণ। তিনি শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চীপরিহিতা। তাঁর কেশদাম দক্ষিণব্যাপী আলুলায়িত এবং তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা। তাঁর চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুল। শিব ও শব সম্পর্কে রামপ্রসাদের এই গানটি বাংলায় খুব লোকপ্রিয়

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে।

কালীপূজা সম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রবাদ হল নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পূজার প্রবর্তন করেন (অষ্টাদশ শতকে) এবং তিনি নাকি আদেশ করেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে কালীপূজা করতে কেউ অস্বীকার করলে তাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই আদেশের ফলে প্রত্যেকবছরে প্রায় দশহাজার কালীমূর্তি পূজা করা হত। কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র হাজার-হাজার মণ নৈবেদ্য, হাজার হাজার কাপড় এবং সমপরিমাণ অন্যান্য উপচারে কালীদেবীর পূজা করেছিলেন। প্রবাদ সত্য-মিথ্যা যাই হোক, কেবল নদীয়ায় নয়, বাংলা দেশে সর্বত্র, বৈষ্ণব ভক্তির আবেগ ও প্রহরব্যাপী সংকীর্তনাদির প্রবল জোয়ারের মধ্যেও শক্তিদেবীদের মধ্যে কালীর প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলা যায়। প্রায় সমস্ত দেবদেবীর পূজাই সম্প্রতি ক্রমে বাড়তে থাকলেও এবং তার উৎসব-হল্লার

বাহুল্যের মধ্যেও, পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কালীপূজার স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য আজও খর্ব হয়নি।

'কালী' কেন্দ্র করে শক্তিসাধনার এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রতিফলন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। কেবল লক্ষ্য করার মতো নয়, নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিদেবীর মধ্যে প্রধানত কালীকে কেন্দ্র করে বাঙালীর সামাজিক জীবন বহুক্ষেত্রে বিভিন্নদিকে পরিচালিত হয়েছে। এই দিকগুলি যে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান-আচরণের সঙ্গে যুক্ত, এমন কথা বলা যায় না। সমগ্র সমাজ-জীবনের মধ্যে রাজনীতির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে এখানে আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত দিয়েই আরম্ভ করছি।

বিদেশী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন উনিশ শতকের শেষপর্বের আবেদন-নিবেদনের বদ্ধ অলিগলি দিয়ে যখন বিংশ শতকের স্বদেশী আন্দোলনের প্রশস্ত মুক্ত রাজপথে পৌঁছল, তখন তার বলিষ্ঠ সংগ্রামের রূপ কেবল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের মধ্যে প্রকাশ পেল তা নয়, বিদেশী শাসকদের স্বদেশ থেকে বলপ্রয়োগ দ্বারা বিতাড়িত করার প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদ হল এই প্রচেষ্টার অন্যতম রূপ। বাংলার রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই রূপ প্রধানত শক্তির প্রত্যয়রূপে দেবী কালীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই সময়কার বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্তসমিতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কালী ধর্মীয় শক্তি-দেবীরূপে নয়, সমস্ত শক্তির প্রধান উৎসরূপে কতদূর তাদের নেতা ও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্র ঘোষ, বিনয়-বাদল-দীনেশ-ক্ষুদিরাম প্রভৃতি সকলেই কালীকে শক্তির উৎসরূপে যে গ্রহণ করেছেন তা নয়, অশুভ অসুরশক্তি বিনাশের প্রতীকরূপেও কালীমূর্তি থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি।

২৫মে ১৯০৭ শনিবার রাতে শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের গৃহে শক্তি উৎসবের একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল যে বক্তৃতা করেন তাতে দেশের সর্বত্র, গ্রামে গ্রামে, কালীপূজার উৎসবের কথা প্রচার করে তিনি বলেন—"the holding of such midnight ceremonials at regular inter vals will have a grand meaning and will do wonders, as you all

know one time *chapatis* had done wonders." বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, মধ্যরাতে কালীপূজা করলে তার ফল চমৎকার হবে। একসময় 'চাপাটি' বিদ্রোহকালে (যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ) যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, কালীপূজার উৎসবও তাই করবে। এই সভাতেই দক্ষিণভারতের একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বলেছিলেন "We ought to go abroad and learn the manufacturing of bombs and other destructive weapons and how to wield them (even the Czar of Russia trembles at bombs), and return to our country to sacrifice every Amavasya night 108 whites (not white lambs but those who are our enemies), and there the bright prospect of the whole nation lies for the future.[৪]" জাতীয় সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টি-ভঙ্গি এই উক্তির মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

ব্রিটিশ শাসকরা দেশের শত্রু, তারাই 'অসুর'। ইংরেজ-নিধন আর অসুর-নিধন অভিন্ন। কালী অসুরনিধনের প্রতীক, সাধারণ নিপীড়িত মানুষ তাঁর আশ্রিত। তাদের তিনি বরাভয় দেন একহাত তুলে, অন্যহাতে খড়্গ ধারণ করে উন্মত্তের মতো অসুরবিনাশ করেন। কালীর এই প্রতীক-মূর্তি আমাদের দেশের, বিশেষ করে বাংলার, মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকরা ধ্যান করেছেন, প্রেরণার উৎসরূপে গ্রহণ করেছেন। তার ফলে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি হয়নি যে তা নয়, অবশ্যই হয়েছে, যেহেতু দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশ—মুসলমানরা এই আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কালীর ভূমিকা ধর্মাচরণের ভূমিকা নয়, সশস্ত্র বিদ্রোহের ভূমিকা। সন্ত্রাসবাদীরা 'কালী-বোমা' (Kali-bomb) তৈরি করেছেন, কালী ও ভবানী-মন্দির স্থাপন করেছেন, কালীভক্ত বলে নয়, শাক্ত-উপাসক বলে নয়, দেশভক্ত বলে। লক্ষণীয় হল, মুক্তি-আন্দোলনের এই ধারাই পরবর্তী-ষাট-সত্তরের দশক পর্যন্ত, কমিউনিস্ট আন্দোলনে নকশালপন্থীদের সংগ্রামেও প্রতিফলিত হয়েছে। শোনা যায়, বিশিষ্ট নকশালনেতা দুএকজনের 'গুপ্ত-গুহায়' নাকি লেনিন-মাওএর ছবির পাশে কালীর মূর্তিও থাকত। অনেকে তাতে বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু কোনো বিপ্লবী নেতাকে তার জন্য একজন তান্ত্রিক

৪. James Campbell Kerr: Political Trouble in India, 1907-1917: Calcutta 1973.

'অবধূত' না ভাবলেও ক্ষতি নেই। 'লাল পতাকা' (Red flag) কী? প্রতীক নিশ্চয়। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিটা কী? নিশ্চয় প্রতীক-ধ্বনি। ভাষাই তো প্রতীক। তা হলে কালীমূর্তিরও প্রতীক হতে বাধা নেই, যদি-না ধর্মীয় প্রতীকরূপে তার অপব্যবহার করা হয়। ডাকাতরা আমাদের দেশে কালীপূজা করে কেন? কালীস্থানে নরবলি-পশুবলি দেওয়া হয় কেন? বাংলাদেশে 'ডাকাতে কালীর' প্রাচীন স্থানের ও কিংবদন্তীর অভাব নেই? ডাকাতরা কি কেবল পুলিশ-অভিধানের সংজ্ঞানুসারে ডাকাত, অথবা তার চেয়ে বেশি কিছু? তাদের দস্যুবৃত্তির চেতনার সঙ্গে গণমুক্তির রাজনৈতিক বিপ্লবচেতনা মিশিয়ে দিতে পারলে, রঘু-ডাকাত, বিশু-বদে-ডাকাত হয়ত বিপ্লবের ছোটবড় নায়ক হতে পারত, মুক্তিসংগ্রামের সৈনিক-সেনাপতি হতে পারত। কিন্তু তখন লাল পতাকার যুগ ছিল না, কণ্ঠভরা বৈপ্লবিক স্লোগানের যুগ ছিল না, কালীর যুগ ছিল, তাই কালী ছিলেন বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রতীক, সর্বস্তরের জন-শত্রুনিধনের প্রতীক, যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল আজও জনগণের মর্মস্থল পর্যন্ত প্রসারিত। সেই মর্মস্থল থেকে উৎপাটিত করে কালীপূজাকে আজ আমরা মস্তানী স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত করেছি, শোষক-শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও চক্রান্তে, কিন্তু তার জন্য কালীর কল্পনামূর্তির বৈপ্লবিক প্রতীকমূল্য হ্রাস পায়নি, যেমন বহুক্ষেত্রে 'লাল পতাকার' অপব্যবহার হলেও, তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। কালীর ধ্যানে ও মূর্তিতে ধর্মীয় ভাবের চেয়ে মানবিক-সামাজিক ভাব অনেক বেশি প্রকট, যদিও ধর্মীয় ভাবের বীভৎসতাকেই সমাজের শত্রুরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে অধিকতর প্রকট করে তুলছেন।

বিনয় ঘোষ । নববাবুচরিত

আজ থেকে ৩৬/৩৭ বছর আগে ১৯৪২-৪৩ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে, বিনয় ঘোষ তরুণ বয়সে সমাজের বিপর্যয় ও পরিবর্তন লক্ষ্য করে যে রচনাগুলি লিখেছিলেন, তা আজকের দিনেও জীবন্ত সত্য মনে হবে 'নববাবুচরিত' পড়লে। প্রখ্যাত প্রয়াত শিল্পী পিসিয়েল ও চিত্তপ্রসাদের এবং শ্রীসূর্য রায়ের চিত্র-সম্বলিত। প্রকাশ আগস্টের মধ্যে। মূল্য দশ টাকা।

ডাস্টবিন । বিনয় ঘোষ

বিনয় ঘোষ যে একদা পাকা গল্প লিখিয়ে ছিলেন তা আজকের পাঠকদের অনেকেরই জানা নেই। নতুন গ্রন্থাকারে, সুখ্যাত শিল্পী শ্রীগণেশ পাইনের প্রচ্ছদসহ, এই গল্প সংকলন ডিসেম্বরেই (১৯৭৯) প্রকাশিত হবে।

মূল্য দশ টাকা।

ল্যাবোরেটরী । বিনয় ঘোষ

এই নাটিকাটি বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন ফ্যাশিস্টবিরোধী গণনাট্য আন্দোলনের সূচনাকালে। আজকের দিনেও এই নাটিকার অভিনয় করা যায়, যেহেতু ফ্যাশিজমের সংকট আজ ঘরের দরজায়: শ্রীসুবী প্রধানের গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের দীর্ঘ ভূমিকাসহ নাটিকাটি পূজাবকাশের পরে প্রকাশিত হবে। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

সাম্প্রতিক । ৫২/২ শিকদার বাগান স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৬

সিলেব্‌ল-তত্ত্ব ও বাংলা ভাষার সিলেব্‌লের সংগঠন

পবিত্র সরকার

[প্রয়োজনীয় ধ্বনিপ্রতীক

অ ['অত'-র 'অ', 'অতি-'র 'অ' নয়] = O

ও = o	ঙ, ং = M	ড = D
আ = a	য় = e	ঢ = Dh
ই = i	শ = S	ড় = ṛ
উ = u	স = s	ঢ় = ṛh
এ = e	ট = T	চ = c
অ্যা = A	ঠ = Th	ছ = ch

আনুনাসিক স্বরে স্বরচিহ্ন + N

অর্থাৎ আঁ = aN, ওঁ = oN

আর যে-স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণে অর্ধস্বরের চেহারা নেয়, যেমন 'বউ'-এ উ, 'হই'-এ-ই, সেগুলির ধ্বনিপ্রতীক ইটালিক্‌সে দেওয়া হল।

বাকীগুলি বাহুল্যবোধে দেওয়া হল না। P যে 'প্'—তা সবাই ধরে নেবেন নিশ্চয়ই। প.স.]

১.

সিলেব্‌ল বা 'অক্ষর'-এর ('বর্ণ' বলতে যে 'অক্ষর' বোঝায় তা থেকে একে পৃথক রাখতে হবে) চরিত্র নিয়ে আলোচনার ইতিহাস যত দীর্ঘ, বিতর্কের ইতিহাসও ততই দীর্ঘ[১]। আজ পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বে সিলেব্‌লের একটা সন্তোষজনক সংজ্ঞা যে তৈরি হয় নি এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। কথাটা শুনতে বিস্ময়কর শোনায়, কিন্তু সমস্যা সম্বন্ধে আংশিক ধারণা থাকলে সে বিস্ময় অন্তর্হিত হতে সময়

লাগে না। প্রথম সমস্যা হল, সিলেব্‌ল ভাগ করব কিসের ভিত্তিতে? আমরা যখন কথা বলি তখন মোটেই সিলেব্‌ল ভাগ করে কথা বলি না, ধ্বনিগুলি সার বেঁধে পরপর উচ্চারণ করে যাই। সাউণ্ড স্পেক্টোগ্রাফ নামক যন্ত্রে তোলা ছবিতে মানুষের ভাষার এই নিরবচ্ছিন্ন সংলগ্নতার চিত্রটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ ছাপায় বা লেখায় দুটি 'ওঅর্ড' বা শব্দের[৭] মধ্যে যেমন ফাঁক রাখছি—তার ফলে বুঝতে পারছি শব্দগুলি স্বতন্ত্র—কথায় সে রকম ফাঁক রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানে শব্দগুলি ঠাসাবুনোন হয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে মুখ থেকে বেরোচ্ছে। তবে এটা ঠিক যে, শব্দের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আমরা খেয়াল রাখি, কেউ বুঝতে না পারলে কেটে কেটে, এক-একটা শব্দ আলাদা করে আমরা উচ্চারণ করতে পারি। আর ধ্বনি বা sound-এর হিসাবও আমাদের ঠিক থাকে—ভুল শুনলে বা ভুল উচ্চারণ করলে খাঁটি ধ্বনিটি আমরা শুনিয়ে দিতে পারি—বাচ্চাদের বা বিদেশীদের কথা শোধরানোর বেলায় যেমন করি। কিন্তু সিলেব্‌লের বিষয়টা কি এমন করে খেয়াল রাখি? এর উত্তর যে 'না', সেটা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন।

যাঁরা বাইরে থেকে জিনিশটাকে আবিষ্কার করার, এবং তাকে ভাগ করার একটা ভাষানিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত নীতি বা নিয়ম উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, সেই ধ্বনিবিজ্ঞানী বা ফোনিটিশিয়নদের সে জন্য সিলেব্‌ল নিয়ে খুব মুশকিলে পড়তে হয়েছে। কেউ কেউ[৮] অক্ষরের ধ্বনিতাত্ত্বিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন—বলেছেন, ধ্বনির ছোটবড় দল থাকতে পারে কিন্তু ওরকম মাপা-মাপা অক্ষর-বিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাষাটা জন্মগতভাবে বলছে সে হয়তো তার নিজের আন্দাজমতো শব্দগুলিকে টুকরো করে দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যে ভাষাটা জানে না তার হাতে এমন কোনো অস্ত্র নেই যার সাহায্যে সে ঐ ভাষার বাক্‌প্রবাহকে ঠিক অক্ষরের মাপে মাপে খণ্ড-খণ্ড করে নিতে পারে। কারণ সিলেব্‌লের ভাগ এক-এক ভাষায় এক-এক রকম। বের্টিল মামবার্গ অবশ্য হাসকিন্‌স ল্যাবরেটরিতে কিছু অর্থহীন সিলেবল নিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মানুষের ব্যঞ্জনের উচ্চারণের মধ্যে যে ধ্বনিগত 'আস্ফোট' (Plosion) ঘটে তার মাত্রা বিচার করে অক্ষরের একটা সীমানা ঠিক করে ফেলার কাজটা একেবারে অসম্ভব নয়[৬]। অর্থাৎ ভাষানিরপেক্ষ একটা মানদণ্ড হয়তো নির্মাণ করা যায় অক্ষর-বিভাজনের। কিন্তু এই সব পরীক্ষা মূলত পশ্চিমী ভাষাগুলির ধরনধারনের উপর নির্ভর করে চালানো হয়েছে বলে, এবং ওসব ভাষায় আস্ফোটের পরিমাণ ও ঘটনা স্পষ্টতর বলে এ সিদ্ধান্ত পশ্চিমী

ভাষাগুলির উপর যতটা খাটবে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উপর ততটা খাটবে কি না সন্দেহ। তবু মামবার্গের পরীক্ষা সুনিশ্চিতভাবে ধ্বনিবিজ্ঞানীদের সিলেব্‌লের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের খানিকটা উপশম করেছে।

মামবার্গের এই প্রয়াস সত্ত্বেও এ পর্যন্ত অক্ষর-সংক্রান্ত যা মাপজোক তা সবই ভাষা-সাপেক্ষ বা 'ফোনোলজিক্যাল'। অর্থাৎ ভাষা-অনুযায়ী অক্ষরের সীমানা তৈরি হয়—এবং কোথায় তার আরম্ভ ও কোথায় শেষ, তা ভাষাই নির্ধারণ করে। এক ভাষার অক্ষর-গঠনের চরিত্র অন্য ভাষায় হুবহু একরকম নয়। CVCVCV অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন (Consonant) ও একটি স্বরের (Vowel) এই ক্রমকে নিম্নরূপে একাধিক অক্ষরে ভাগ করা যদি যায়

১. CV-CV-CV
২. CVC-V-CV
৩. CV-CVC-V
৪. CVC-VC-V

তা হলে হয়তো দেখা যাবে এক-এক ভাষা এক-একটি বিভাজন বেছে নিচ্ছে, কোনো দুটি ভাষার এই নির্বাচন ঠিক একরকম হচ্ছে না। এটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কোনো ধ্বনিগুচ্ছে দুটি ব্যঞ্জন পাশাপাশি থাকে—ধরা যাক CVCCV জাতীয় একটি রূপে। এটি কীভাবে ভাগ হবে? CV-CCV, না CVC-CV, না CVCC-V, তা সব সময় নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিবিন্যাসগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। তদ্ভব বাংলায় কেবল CVC-CV এই বিভাজনই সম্ভব।

তবে সারা পৃথিবীর অসংখ্য ভাষার অক্ষরের ধর্ম লক্ষ করে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তার গড়ন সম্বন্ধে একটা সাধারণ হিসাবে পৌঁছেছেন। ফলে এখন সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, সাধারণভাবে সিলেব্‌ল তৈরির জন্য ন্যূনতমভাবে একটি V (স্বরধ্বনি) থাকতেই হবে[৫]। ঐ স্বরধ্বনিটিই হল অক্ষরকেন্দ্র (Syllable-nucleus) অথবা তার শীর্ষ (peak)। পাইক ও পাইক (১৯৮৮) গড় সিলেবলের গঠনকে এইভাবে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন[৯]:

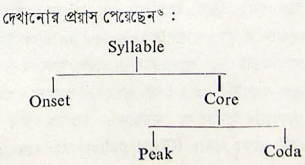

একটি 'শীর্ষ' বা V থাকলেই অক্ষর হয়। কিন্তু তার দুদিকে প্রায়ই এক বা একাধিক ব্যঞ্জনের প্রাচীরও থাকতে পারে। স্বরধ্বনিটির আগে যদি ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকে—ইংরেজি 'stroke' শব্দের str —যেমন—তা হল onset (মামবার্গ এ অবস্থানে একক-ব্যঞ্জনের নাম দিয়েছেন explosive)। আর V-এর পরে যদি ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকে, তার নাম coda (এ স্থানের একক-ব্যঞ্জনের মামবার্গের দেওয়া নাম implosive)।

শুধু V দিয়ে সিলেব্‌ল তৈরি হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন ভাষা নেই। তার সঙ্গে ব্যঞ্জন থাকতেই হবে। তবে সবচেয়ে বেশি কোন্ ধরনের সিলেব্‌ল দেখা যায়, তার উত্তরে বলতে হবে CV-গড়নের অক্ষরই পৃথিবীর ভাষাগুলিতে সবচেয়ে বেশি এবং ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে প্রাচীনও বটে[৭]। কিন্তু আরো বহু ধরনের অক্ষর তৈরি হয়েছে মানুষের ভাষায়। Onset অংশে একাধিক ব্যঞ্জন এবং coda অংশে তারো চেয়ে বেশি ব্যঞ্জন দেখা গেছে। অর্ধস্বর (Semi-vowel) অবশ্য onset বা coda-তে একটির বেশি থাকতে পারে না। হাওয়াইয়ান, মাওরি, জাপানি ইত্যাদি ভাষায় একদিকে যেমন শুধু V এবং CV ধরনের—অর্থাৎ গড় ছক হিসেবে শুধু (C) V ধরনের—অক্ষর আছে, তেমনি সংস্কৃত, ইংরেজি, জার্মান, সুইডিশ ইত্যাদি onset অংশে CCC জাতীয় ব্যঞ্জনগুচ্ছও দেখা যায়। Coda অংশে সুইডিশে —tskt, —mskt ইত্যাদি চারটি ব্যঞ্জন বসতে পারে, জর্জিয়ান ও কিছু আমেরিকান ইণ্ডিয়ান ভাষায় নাকি ছটি ব্যঞ্জনও দেখা যায় coda হিসাবে[৮]।

সিলেব্‌লের ভাগ করতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা যে দেখা দেয়, আগেই তার ইঙ্গিত করেছি। ফরাসি ও স্প্যানিশে যাকে 'liaison' বলে তা এক ধরনের সমস্যা। এ ভাষা দুটিতে একটি শব্দের অন্ত্যব্যঞ্জন পরবর্তী শব্দের আদি স্বরের সঙ্গে জুড়ে যায়, ফলে শব্দের সীমানাকে অগ্রাহ্য করে অক্ষরের সীমানা কাটতে হয়। Le bon homme কথাটিতে সিলেবলের ভাগ Le/bo/nhomme—এইভাবে করতে হয়। কিন্তু ইংরেজিতে তা হয় না—সেখানে অক্ষর-সীমা শব্দসীমার প্রভুত্ব মেনে নেয়। ফলে a name এবং an aim উচ্চারণক্রমের দিক থেকে এক হলেও এ দুটি ক্ষেত্রে শব্দের সীমানা ধরেই অক্ষরের বেড়া বসাতে হয়। বাংলার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম—এ ভাষাতেও শব্দসীমার মাহাত্ম্য বেশি, তার খবরদারি মানতে হয় অক্ষরকে। অনেকে বলেন উচ্চারণ করতে গিয়ে এক একটি বুকের ধাক্কার (Chest pulse) সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি অক্ষর

উচ্চারিত হয়—কিন্তু সে হিসাবও যে ঠিক নয় তা ল্যাড্‌ফোগেড দেখিয়ে দিয়েছেন[৯]। বাংলা ভাষার অক্ষর শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াচ্ছে সে কথা বলার আগে আরেকটু ভূমিকা করে নিই।

২.

একথা সকলেরই জানা যে, মানুষের ভাষায় যে সব স্বর, ব্যঞ্জন বা এ দুয়ের মাঝামাঝি ধ্বনি ব্যবহৃত হয় সেগুলি এমন কিছু অসংখ্য নয়। আবার এক ভাষার ধ্বনির সঙ্গে অন্য ভাষার ধ্বনিগুচ্ছের আংশিক এবং উপর-উপর মিলও আছে। দেখেশুনে মনে হয়, যেন একজাতীয় ধ্বনির একটি বৃহৎ ঝুড়ি থেকে পৃথিবীর সব ভাষাই তাদের নিজের নিজের ধ্বনিমালা তুলে নিয়েছে—সে সব ধ্বনির চেহারায় ও ব্যবহারে অল্পবিস্তর রকমফের থাকলেও তাদের উৎস যেন বা এক। এমন কোনো ভাষা নেই যাতে 'আ' স্বরধ্বনিটি নেই; প্রায় সব ভাষাতেই আছে প্, ত্, ক্, ব্, দ্, গ্ জাতীয় ধ্বনি, যদিও ভাষায় ধ্বনির সংখ্যার হেরফের আছে মন্দ নয়। এমন ভাষার খোঁজ পাওয়া গেছে যেটি মোটে দশটি ধ্বনি নিয়ে কাজ চালায়, আবার এমন ভাষারও খোঁজ পাওয়া গেছে যার ধ্বনির সংখ্যা সত্তর (৭০) টি। তবু পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাই গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশটির মতো ধ্বনি (অর্থাৎ 'ফোনিম', যাকে বাংলায় বলা হয় "মূলধ্বনি" বা "স্বনিম") ব্যবহার করে[১০]। আমাদের বাংলায় অর্থাৎ শিষ্ট চলিতভাষায় এইরকম ধ্বনির সংখ্যা, আনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলিকে বাদ দিয়ে, চৌত্রিশটি[১১]। যদিও একথা মানতেই হবে যে, একটি ধ্বনি নানা ভাষায় থাকলেই যে তার উচ্চারণগত লক্ষণ এবং ভাষায় তার প্রয়োগ সব ভাষাতেই হুবহু এক হবে এমন কোনো কথা নেই—ইংরেজির 'p', ফরাসির 'p' আর বাংলার 'প্' এক নয়—কিন্তু তাই বলে তাদের উচ্চারণগত সাধারণ মিলগুলি (প্রত্যেকেই ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, প্রত্যেকেই অঘোষ) কে অস্বীকার করবে? ভাষায় ভাষায় নানা ধ্বনির এই বাইরের মিল হওয়ার কারণ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষার ধ্বনি উচ্চারিত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখে, উচ্চারণ করে অধিকাংশত জিহ্বা আর ঠোঁট। তার আর কত বৈচিত্র্য হবে? সিদ্ধিভাষায় বাইরে থেকে বাতাস টেনে নিয়ে চুমু খাওয়ার মতো আওয়াজ করা 'ব্' বা পশ্চিম আফ্রিকার একাধিক ভাষায় যুগ্ম ব্যঞ্জন 'গ্‌ব্' বা 'কপ্'[১২] এরই

মধ্যে একটু বিচিত্র ধরনের মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের উচ্চারণের সম্ভাবনার যে পরিমিত ক্ষেত্র, এ ধ্বনিগুলিও তার বাইরে নয়।

প্রত্যেক ভাষার কানে-শোনার রূপটি গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ধ্বনি ক'টি, সেগুলি কী ধরনের এবং সেগুলি কোথায় কীভাবে বসছে—এইসব আয়াম বা ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করে। ভাষার ধ্বনিগুলি কীভাবে সাজানো হচ্ছে, স্বর ও ব্যঞ্জন কে কার পাশে বসছে বা বসছে না; শব্দের (word-এর) আগে, মাঝখানে ও শেষে কারা আসতে পারছে, কারা আসতে পারছে না—ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বা ফোনোলজির এইসব হিসাবের একটি হল তার সিলেব্‌ল বা অক্ষরের গড়ন। ভাষার ধ্বনিচরিত্র অনেকসময় তার অক্ষরের চরিত্রের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। লোকশ্রুতিতে কোন্ ভাষা 'মিষ্টি', কোন্ ভাষা 'খট্‌খটে', কোন্ ভাষা 'পৌরুষব্যঞ্জক'[১০], কোন্ ভাষা 'মেয়েলি'—এইসব স্পষ্ট-অস্পষ্ট ধারণা সাধারণভাবে তার ধ্বনিগুচ্ছ, ধ্বনিসমবায়ের নিয়ম এবং অক্ষরের গড়ন থেকেই তৈরি হয়ে যায়। কাজেই একটি ভাষার অক্ষরের চরিত্র থেকে তার সর্বাঙ্গীণ ধ্বনি-চরিত্রও খানিকটা আন্দাজে আসে। লুই হিয়েম-স্লেব (Hjemslev) খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন জিনিশটা, ···the sign-possibilities (i.e., of a language, প.স.) depend directly on the syllable-possibilities." এবং...there *are* special rules in the linguistic structure governing the shape of *syllables* and signs must, of course, be so constructed as not to violate them." (দ্র *Language*, The University of Wisconsin Press, 1970, p. 34-5) আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষরের বিশিষ্ট ছকগুলি লক্ষ করে এর ধ্বনিধর্ম নির্ণয় করবার চেষ্টা করব।

৩.

বাংলার বেশি ঝামেলা নেই। আগেই বলেছি, বাংলার অক্ষরকেন্দ্রে একটি স্বরধ্বনি বা V-এর অধিষ্ঠান। তার দুপাশে ক্ষেত্রবিশেষে C বা ব্যঞ্জনধ্বনির দেয়াল থাকে। কিন্তু বাঁদিকে, অর্থাৎ অক্ষরের প্রথমে onset হিসাবে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি হলে তিনটি C থাকতে পারে, আর অক্ষরের শেষে

বেশির পক্ষে দুটি। তাহলে বাংলা অক্ষরের গড় ছকটি আপাতত দাঁড়াচ্ছে এইরকম

(C) (C) (C) V (C) (C)

বা অন্যভাবে, C_0^3 VC_0^2

অর্থাৎ শুধু V দিয়ে বাংলা অক্ষর যেমন তৈরি হতে পারে, তেমনি V-এর বাঁদিকে ক্ষেত্রবিশেষে এক থেকে তিনটি এবং ডানদিকে এক বা দুটি C-ও থাকতে পারে। এখানে C-র পাশে উপরের সংখ্যাটি (2/3) সর্বাধিক ব্যঞ্জন (consonant)-এর সম্ভাব্য সংখ্যা এবং নিচের সংখ্যাটি (0) তার সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সংখ্যা। অর্থাৎ বাংলা সিলেবলে V-এর বাঁদিকে বেশির পক্ষে তিনটি, কমপক্ষে শূন্য সংখ্যক C থাকতে পারে। ডানদিকে আবার বেশির পক্ষে দুটি, কমপক্ষে শূন্য C বসতে পারে। একথা খেয়াল রাখতে হবে যে, এই ছকের ব্যাপ্ততম সম্ভাবনা, অর্থাৎ CCCVCC চেহারার কোনো অক্ষর বাংলায় নেই। বাংলায় বড় জোর CCCVC পাই, না হয় CVCC পাই। [পরে এই ছকের সংশোধন দ্রষ্টব্য]। এইসব সম্ভাবনা বিশদ করে বাংলা অক্ষরের খতেনটি এইরকম দাঁড়ায়

৩.১ V

উদাহরণ [কিছু ক্ষেত্রে শব্দ ভেঙে অক্ষর দেখানো হচ্ছে] :

এ [e]; ও [o]; আ- [a]-সি ; ই- [i]-তি ;

উ-[u]-নি ; অ-[O]-ত ; অ্যা-[A]-ত।

৩.২ CV

উদাহরণ :

যা [ja]; দে [de]; হ্যাঁ [hAN]; কি [ki];

ব্যা [bA]; ধো [dho]

৩.৩ VC

উদাহরণ :

এক [Ak]; এর [er]; ওঠ্ [oTh]; ইস্ [iS]

উফ্ [uph]; আন্ [an]; অপ্ [Op] ইত্যাদি

৩.৪ CVC

উদাহরণ :

ফল [phOl]; পাট [paT]; ছাখ্ [dAkh];

শোক [Sok] ; চল্ [col] ; মাঝ [majh] ;
হোক [hok] ; দম [dOm] ; শেখ [Sekh] ইত্যাদি

খাঁটি বাংলা, অর্থাৎ তদ্ভব বাংলাতে অক্ষরপ্রান্ত বা coda হিসাবে যে-অক্ষরে ব্যঞ্জন থাকে সেখানে কোনো ক্ষেত্রেই একটির বেশি ব্যঞ্জন পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ তদ্ভব বাংলায় অর্ধস্বরওয়ালা অক্ষর (পরে দ্রষ্টব্য) ছাড়া বাকি অক্ষর মূলত এই চার ছকের—V, CV, VC, CVC।

কিন্তু যখন সংস্কৃত বা ইংরেজি থেকে ধার করা তৎসম[১৪] শব্দের এলাকায় পৌঁছোই তখন অবস্থাটা একটু বদলে যায়। তখন দেখি V-এর বাঁ এবং ডানপাশে আরো C এসে বসছে, অর্থাৎ অক্ষরের শুরু ও শেষ—অনসেট ও কোডা উভয়ত্রই যুক্তব্যঞ্জন থাকার সুযোগ ঘটছে। তৎসম শব্দের আনুকূল্যে বাংলায় নিম্নোদ্ধৃত আরো নানা ছকের অক্ষরের উদ্গম হচ্ছে দেখতে পাই

৩.৫ CCV

উদাহরণ :

ব্র-[bro]-ত ; শ্রী [sri] ; ধ্-[dhri]-ত ; প্রী [pri]-তি ;
শ্রু [sru]-তি ; প্র-[pro] ফেসর; ট্রি-[Tri] গোনোমেট্রি ইত্যাদি

৩.৬ CCVC

উদাহরণ :

গ্রাম [gram] ; শ্রম [srom] , ভ্রম [bhrom] : ঘ্রাণ [ghran]
প্রাক্ [prak] ; দৃক্ [drik] ; প্রাণ [pran] ; ত্রাণ [tran]
স্নান [snan] ; কৃষ্ [kriS]-ণ ক্লান্-[klan]-ত ; ট্রাক্ [Trak]
ট্রেন [Tren] ট্রাম [Tram] ; স্লেট [sleT] , ক্লিপ [klip],
স্কুল [skul] ইত্যাদি

৩.৭ CCCV

উদাহরণ :

উদাহরণ অত্যন্ত বিরল। চালু বাংলায় সংস্কৃত থেকে ঋণ করা কয়েকটি অক্ষর পাই—স্ত্রী [stri] ; স্প্ [spri]-হ্যা ; সেইসঙ্গে জুড়ে দিতে পারি ইংরেজির ঋণ স্ক্রু [skru] বা এই ধরনের কিছু অক্ষর।

৩.৮ CCCVC

উদাহরণ :

আমার জ্ঞাতসারে মাত্র এ ক-টি দৃষ্টান্ত—'স্ট্রীর' [strir], স্পৃশ্ [spriS] ; স্পৃষ্ [spriS]-ট ; এবং ইংরেজি থেকে নেওয়া স্প্রিং [spriM] স্ক্র্যাচ] skrAc] ; স্ক্রীন [skrin] ইত্যাদি

৩.৯ CVCC

উদাহরণ :

তদ্ভব বাংলায় শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকতে পারেনা, সংস্কৃতেও তা বিরল। তবে ধ্বনির প্রকৃতি অনুযায়ী কখনো কখনো শব্দে অক্ষরের শেষে যুক্তব্যঞ্জন অর্থাৎ CC লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় ঋণ হিসাবে আসা সেইসব শব্দে অক্ষরের এই গড়ন দেখি, যেমন

সংস্কৃত [SOMS-krito] ; দংষ্ট্রা [dOMS-Tra] ; সংস্পর্শ [SOMs-pOrSo] ; ভর্ংসিত [bhort-Sito], বা অতিরিক্ত শুদ্ধ ও সচেতন উচ্চারণে পঙ্ক্তি [poMk-ti][১৫] ইত্যাদি তবে বাঙালির রসনায় এই উচ্চারণ স্বাভাবিক নয়, তাই কখনো কখনো 'সংস্কৃত' 'সঙোস্কৃত' [SOMoSkrito] হয়ে দাঁড়ায় স্বরভক্তির সাহায্যে, কখনো বা আরেকটু প্রাকৃত ভাবে 'সমোস্কৃত'।

৪

এ পর্যন্ত শুধু স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে বাংলায় আমরা ন জাতীয় অক্ষর লক্ষ করলাম। এবার যৌগিক স্বর বা diphthong ওয়ালা অক্ষরগুলির আলোচনা করা যাক। যৌগিক স্বরের সহজ সংজ্ঞা হল, দুটি স্বরধ্বনি মিলে যদি একটি অক্ষর বা সিলেবল তৈরি হয়, তবেই তা যৌগিক স্বরধ্বনি হবে[১৬]। এখন এই যে দুটি স্বর-ধ্বনি মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর হচ্ছে এক অক্ষরের আওতায় এসে—তার একটিকে অর্ধস্বর হতেই হবে। যেটি পূর্ণস্বর সেটি অক্ষরকেন্দ্র বা অক্ষরের মূলভিত্তি সেজন্য সেটি syllabic বা 'আক্ষরিক'। আর অর্ধস্বরটি ব্যঞ্জনের মতোই অক্ষরের দেয়াল বা বেড়ার কাজ করে, onset বা coda হয়ে নিজে স্বতন্ত্র অক্ষর তৈরি করতে পারেনা, এইজন্য সেটি 'অনাক্ষরিক' বা nonsyllabic। বস্তুতপক্ষে পূর্ণস্বরের পাশাপাশি অনাক্ষরিক এই স্বরধ্বনিটিকেই অর্ধস্বর বলা হয়[১৭]। বাংলা অর্ধস্বরের একটি বড় আশ্রয় এই দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরগুলি। এখন আমাদের বাংলা সিলেবলের গড়নের দেখা যাক কত ধরনের যৌগিক স্বরাশ্রিত অক্ষর বাংলায় রয়েছে, তালিকাটি সম্পূর্ণ করবার জন্য

৩.১০ VV

উদাহরণ :

এই [ei] ; ওই [oi] , আও [ao]-তা ; আয় [ae[১৮]]

ঔ [ou]-ষধ ইত্যাদি

৩.১১ CVV

উদাহরণ :

কই [koi], বউ [bou] ; নও [nOo] ; হয় [nOe] ;

খায় [khae] ; যাই [jai] ; দেয় [dAe] ইত্যাদি।

৩.১২ VVC

উদাহরণ :

ঐক [Oik-ko] ; ঐশ্বরিক [oiS-Sorik] ;

ঔদ্-ধত্য [oud – dhotto] ; আইন [ain] ইত্যাদি।

৩.১৩ CVVC

উদাহরণ :

দৈন—[doin-no] ; চৈত্র [coit—tro] ; বৌদ্-ধ

[boud—dho] ; সৈন্-ধব [So.n—] ; বাইশ [baiS] ;

তেইশ [teiS] ; মাইক [maik] ইত্যাদি।

৩.১৪ CCVV

উদাহরণ :

প্রায় [prae] ; ত্রৈ-[troi] মাসিক ; প্রাই [prai-]-ভেট ইত্যাদি।

৩.১৫ CCVVC

উদাহরণ :

আমার জ্ঞাতসারে একটি মাত্র, কিন্তু সেটিও চালু বাংলার অন্তর্গত নয় ক্লৈব-য [kloib-bo] । ইংরেজি থেকে ঋণে আছে স্টাইল [sTail] ।

৩.১৬ CCCVV

উদাহরণ :

এরও একটিই উদাহরণ আমার মনে পড়ছে, সেটি স্ত্রৈ-[stroi]-ন।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, মোট ষোল রকম ছকের অক্ষর বাংলায় রয়েছে। বিদেশী ঋণ (যেমন 'স্ট্রাইক' বা 'স্পোর্টস') ধরলে আরো দু'একটি ছক পাওয়া যেতে পারে।

৫.

আমার এই লিস্টির শেষ সাতটি ছক নিয়ে দুরকমের তর্ক উঠতে পারে। লক্ষ করতে হবে যে, এই সাতটি ছকেই একটি করে দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর রয়েছে —একটি পূর্ণস্বর ['আক্ষরিক'] ও একটি অর্ধস্বরের [অনাক্ষরিক] যোগফল তা। আমার তালিকায় প্রতিক্ষেত্রেই অর্ধস্বরটির পরে বসছে। প্রথম তর্ক এই নিয়ে উঠবে যে, শুধু তাই বা হবে কেন? অর্ধস্বরটি কি পূর্ণস্বরটির আগে বসতে পারেনা? অনেক ভাষাতেই তো তা হয়, ইংরেজিতে যেমন।

আমাদের উত্তর, হ্যাঁ, বাংলায় কিছু কিছু VV পর্যায় আছে যেগুলি দেখে মনে হতে পারে প্রথমটির অর্ধস্বর, দ্বিতীয়টি পূর্ণস্বর। অর্থাৎ এখানে অক্ষরের বাঁদিকে অনসেট অর্ধস্বরের বেড়া রয়েছে, আমার তালিকার মতো ডানদিকে নেই। হাই তাঁর বইয়ে এরকম বারোটি 'অনিয়মিত' দ্বিস্বরের তালিকা দিয়েছেন[১৯]—ইয়া, ইয়ে, ইও, এয়া, এয়ো, অ্যায়া, অয়া, ওয়া, ওয়ে, উয়ে, উয়া, উয়ো। কিন্তু বলেছেন, "সতর্ক এবং স্বাভাবিক উচ্চারণে তাদের দ্বিস্বর না হওয়ারই কথা কিন্তু দ্রুত এবং অসতর্ক উচ্চারণে তারা দ্বৈতস্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হতেও পারে।" অর্থাৎ আসলে এরা দুটি ভিন্ন অক্ষরের অন্তর্গত, কেবল দ্রুত উচ্চারণেই একটিমাত্র অক্ষরে পরিণত হয়। তখন প্রথম স্বরধ্বনিটির আক্ষরিকতা (syllabicity) লুপ্ত হয়ে তা অর্ধস্বরে পরিণত হয়। সেইজন্যে এগুলি 'অনিয়মিত' দ্বিস্বর।

আমি এগুলিকে দ্বিস্বর বলে গণ্য করিনা, কারণ দ্রুত উচ্চারণ কোনো ভাষার ধ্বনি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি নয়। দ্রুত উচ্চারণে অনেক ধ্বনিই বদলে যায় সাময়িকভাবে, কিন্তু তার সেই বদলে-যাওয়া রূপ ভাষায় তার স্থায়ী রূপ নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাষায় 'একনম্বর' কথাটি বহির্বর্তী সন্ধি বা সমীভবনের ফলে "এঙ্নম্বর" হয়ে যায়। 'ক্' হয় 'ঙ্'। কিন্তু ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাই বলে 'এক' লিখতে কখনো 'এঙ্' লেখেনা। উচ্চারণে ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় 'ক্' 'ঙ' হলেও তাদের বোধের মধ্যে ওটা 'ক্'– ই ; 'ঙ্' নয়। কাজেই হাইয়ের অনিয়মিত দ্বিস্বরের বাঁপ্রান্তের যে অর্ধস্বর, তা আদতে অর্ধস্বরই নয়।

নয় যে, তার পিছনে ঐতিহাসিক যুক্তিও আছে। বাংলায় অর্ধস্বর + পূর্ণস্বর অর্থাৎ VV ভিত্তির অক্ষর নিয়ে কোনো শব্দ শুদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ। ইংরেজি 'y' ও 'w' অর্ধস্বরদুটির উচ্চারণ যতখানি সংবৃত বাংলায় অক্ষর-প্রান্তিক ই বা উ-র উচ্চারণ তত সংবৃত নয়। কিন্তু তা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির জিহ্বা 'ইয়া', 'ইয়ে'

ইত্যাদি স্বরক্রম সহজে মেনে নেয় না। বাংলায় ঐতিহাসিকভাবে 'ইহা > ইআ > এ' যে হয়েছে তা আমরা জানি। -'ইয়া' প্রত্যয়টিরও সেই একই দশা ঘটেছে[২০]। 'দিয়ে', 'নিয়ে'-র 'দে' 'নে' রূপও যে পাওয়া যায় তা তো সকলেরই জানা। হাই কথিত "অনিয়মিত" দ্বিস্বরের সব কটিই আসলে দু-অক্ষরে বিন্যস্ত দুটি প্রতিবেশী স্বরধ্বনি। বিদেশী শব্দের ঋণে যে আদ্য অর্ধস্বর আমাদের কাছে পৌঁছোয় তা বাংলায় এসে তার তীব্রতা হারিয়ে মামুলি স্বরধ্বনি হয়ে যায়। Yes-এর 'y' হয় 'ই', water-এর 'w' হয় 'ও'[২১]।

তর্কের জের টেনে দ্বিতীয় আপত্তি এই উঠতে পারে যে, আমার দেওয়া VV ক্রমগুলির উৎস কী? ওগুলিও কি দুঅক্ষরে ভাগ করে উচ্চারণ করা যায়না? নিশ্চয়ই যায়, যেমন গানে প্রায়ই তা করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণে কখনোই তা সম্ভব নয়। এগুলির স্বাভাবিক উচ্চারণই একাক্ষরী।

৬.

দ্বিস্বরযুক্ত সিলেবলের এবং অর্ধস্বরধ্বনি সংক্রান্ত আরো আলোচনার আগে আমরা আবার বাংলা অক্ষরের ছকে ফিরে যাই। ঐ ষোলোটি অক্ষরের ছককে আমরা এইভাবে একটি গড় চেহারা দিতে পারি

$$(C)\,(C)\,(C)\,V \begin{Bmatrix}(V)\\(C)\end{Bmatrix} (C)$$ [২২]

কিন্তু এ থেকে যে বাংলাভাষার ধ্বনিগত চেহারাটা পরিষ্কার হয়না তা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা আগেই আভাস দিয়েছি যে, বাংলার যেসব অক্ষরের পাশে —তা ডাইনেই হোক আর বাঁয়েই হোক—একটির বেশি C বা ব্যঞ্জনের বেড়া— onset ও coda আছে, সেগুলি ধার করা শব্দের সিলেবল, তদ্ভব বাংলার নয়; হয় সংস্কৃত থেকে ধার, না হয় ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষা থেকে। প্রশ্ন হল, কোন্ ধরনের সিলেবল কতবার ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জন্য আমি একটি ছোটোখাটো হিসাব করেছি, তা থেকে বাংলাভাষায় অক্ষরের প্রত্যেকটির ভূমিকা

মোটামুটি আন্দাজ করা যাবে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র একটি দৈনিক সংখ্যার নানাধরনের খবর থেকে নেওয়া এই হিসাবে

গোনা মোটা সিলেবল	১৬৯৮
V	১১৫
CV	৯১৩
CVC	৪৯৮
VC	৬৩
CCV	৪১
CCVC	১১
CCCV	—
CCCVC	—
CVCC	—
VV	৪৯
CVV	৪৩
VVC	—
CVVC	২
CCVV	২
CCVVC	১
CCCVV	—

বলা বাহুল্য, আমার গোনা অক্ষরগুলির মধ্যে কোনো ছকের দৃষ্টান্ত নেই বলেই যে তারা বাংলা ভাষায় নেই তা নয়। যে জিনিষটা লক্ষ করবার তা হল, CV ছকের অক্ষর বাংলায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রায় ৫৪ %। তার-পরেই যে ধরনের অক্ষর আমরা ব্যবহার করছি তা CVC, ৩০ % শতাংশের একটু কম। V ধরনের অক্ষর ৭ % এর মতো, VC ৩ % থেকে ৪%, CVV আর CCV ২% এর মতো। আর সব অক্ষরের ব্যবহার অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য ভাষারীতি অনুযায়ী এবং আরো অনেক বেশি সিলেবলের হিসাব করলে, এই হিসাব একটু-আধটু বদলাবে, কিন্তু মূল হিসাবের খুব একটা হেরফের হবে বলে মনে হয় না।

মনে হচ্ছে, CV আর CVC ধরনের অক্ষরের সুপ্রচুর ব্যবহারই বাংলা ভাষার ধ্বনিচরিত্রের বিশেষ রূপটি তৈরি করে দিচ্ছে।

৭.

কিন্তু এই ধ্বনিগত চরিত্র-নির্ধারণ ছাড়া সিলেবলের আর কি কোনো ভূমিকা আছে বাংলা ভাষায় বা তার ইতিহাসে? সম্ভবত আছে। আমরা দেখতে পাব যে তত্ত্ব বাংলার সিলেবলের ধ্বনিশরীর নির্মাণে যে-সব নিয়ম কার্যকরী—যুক্তব্যঞ্জনের বিভাজন, লোপ ইত্যাদি—সেগুলি তার পদগঠনের নিয়মাবলিতেও বর্তমান। অর্থাৎ এ ভাষার অক্ষরগঠনের নিয়ম থেকেই এর পদগঠনের অনেক ধ্বনিগত নিয়ম বলে দেওয়া যায়। সেগুলির মধ্য থেকে যুক্তব্যঞ্জন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা আমরা এখানে প্রথমে করছি।

বাংলা অক্ষরের এই গড়ন এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারের গৃহীত স্তরে অর্থাৎ loanword-এর স্তরে তার বিন্যাস দেখে কয়েকটি সাধারণ কথা মনে আসে। ফরাসি বা স্পানিশ ভাষায় অক্ষরসীমা যেভাবে শব্দসীমার তোয়াক্কা না রেখে নিজের স্বাধীন চৌহদ্দি স্থাপন করে তা আমরা দেখেছি। তুর্কী, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান কোনো কোনো ভাষা—যেগুলি স্বভাবের দিক থেকে agglutinating বা সংযোগাত্মক—অর্থাৎ যেসব ভাষায় শব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে পুরো বাক্যটাকেই একটা শব্দের চেহারা দেয়—সেগুলিতেই সিলেবলের এরকম ব্যবহার আশা করা যায়। কিন্তু বাংলায় সাধারণভাবে অক্ষর শব্দের শাসন মেনে চলে, অর্থাৎ তার সীমানা শব্দের সীমানাকে অগ্রাহ্য বা উল্লঙ্ঘন করে না। তৎসম স্তরে বাংলা শব্দ সংস্কৃত বড়ো বড়ো শব্দের মাপজোক অনুযায়ী সাত (প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব → প্রোৎ-তুৎ-পন্-নো-মো-তিৎ-তো) সিলেব্‌ল বা তারো বেশি হতে পারে। 'গোপীজনপদরেণুবল্লভ' এই সমাসনিষ্পন্ন নামটিকে একটি শব্দ বলে ধরলে এর সিলেব্‌ল হয় এগারোটি—'ন', 'দ,' ও 'ভ'-এর স্বরান্ত উচ্চারণ ধরে। এর কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই।

তবে বাংলা সিলেব্‌লে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহারের একটা হিসাব পাওয়া যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে, যদি, বাংলা অক্ষরের onset শব্দের আরম্ভের সঙ্গে এক হয় তাহলে তাতে বেশির পক্ষে তিন ব্যঞ্জনের যুক্তধ্বনি পাওয়া সম্ভব—CCC—এই ক্রমে। যেমন স্ত্রী, স্পৃহা। কিন্তু শব্দের মধ্যে যে CCC থাকবে তা অবশ্যই হয় C—CC রূপে, না হয় ক্বচিৎ CC—C রূপে ['ভৎর্সনা' ইত্যাদিতে যেমন] আগের সিলেব্‌লের কোডা ও পরের সিলেবলের অনসেটে ভাগ হয়ে যাবে। বানানে যাই থাক, উচ্চারণে এটাই ঘটবে। 'ইস্ত্রি', 'দুষ্প্রাপ্য', 'নিষ্কৃতি',

ইত্যাদি শব্দে যে যুক্তব্যঞ্জন আছে তার ব্যঞ্জন তিনটি দুটি সিলেবলে ভাগ হচ্ছে এই ভাবে—ইস্‌-ত্রি, দুষ্‌-প্রাপ্‌-পো, নিষ্‌-কৃ-তি; এখানে C CC হয়ে যাচ্ছে সব কটাই।

আবার শব্দের মধ্যে যদি—CC—অর্থাৎ দু-অক্ষরের যুক্তব্যঞ্জন থাকে তার ভাগ হবে C—C। প্রথম C আগের অক্ষরের কোডা হবে, দ্বিতীয় C পরের অক্ষরের অনসেট। উদাহরণ হিসাবে 'রত্ন' (রত্‌-নো), বাল্মীকি (বাল্‌-মি-কি), 'বর্তুল, (বোর্‌-তুল্‌), মস্তান (মস্‌-তান্‌) ইত্যাদি শব্দগুলিকে তুলতে পারি। তবে ধ্বনিসমবায়ের চরিত্র অনুযায়ী অক্ষরের সীমানা ঠিক থাকলেও সময়বিশেষে তা নির্ধারণে একটু সমস্যা দেখা যেতে পারে। যেমন যুক্তব্যঞ্জনের জায়গায় যদি যুগ্মব্যঞ্জন পাই—যেখানে দুটি ব্যঞ্জন একই বা একই ধরনের—সেখানে ঐ সীমা কেবল মনস্তাত্ত্বিক সীমারেখা হয়ে দাঁড়ায় ('বিশ্বাস' কথাটিকে উচ্চারণে 'বিশ্‌-শাস' রূপে ভাঙা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় উদ্ধার', 'উচ্ছ্বাস', 'উদ্যান' 'বিজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দকে। অর্থাৎ 'রত্ন'-তে 'ত' থেকে 'ন'-এ যেতে জিভ খানিকটা বিরাম নিচ্ছে—জিভের আগা 'ত'-এর জায়গা থেকে 'ন'-এর জায়গায় টোকা মারছে দুটো ধাপে। কিন্তু 'বিশ্বাস' ইত্যাদিতে জিভ একই জায়গায় থেকে দুটো ব্যঞ্জন পরপর উচ্চারণ করছে। তফাত শুধু এই যে, যে-ব্যঞ্জনটি কোডা, সেটি unreleased থাকছে, অর্থাৎ তার পরে জিভ ন্যূনতম বিরামও পাচ্ছে না—কিন্তু অনসেটের ব্যঞ্জনটি মুক্ত বা released হচ্ছে—কারণ জিভ পরবর্তী স্বরধ্বনিতে গিয়ে বাতাসের পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

শব্দমধ্যবর্তী র-ফলা-ওয়ালা দু-ব্যঞ্জনের যে যুক্তব্যঞ্জন, অর্থাৎ যে VCCV ক্রমের দ্বিতীয় C-টি 'র্', তার বেলায় বাংলাভাষার ধ্বনিসংস্থাপনে একটি বিচিত্র জিনিশ ঘটছে। লেখায় যাই থাক—উচ্চারণে ক্রমটি দাঁড়াচ্ছে VCCCV। তাতে প্রথম C-টির দ্বিত্ব হচ্ছে, অর্থাৎ শেষের C-টি 'র্' হওয়ার ফলে আগের C-টির আগে আরেকটি ঠিক ঐ C এসে বসছে। নিয়মটি এইরকম

$$C_x \rightarrow C_x C_x \; / \; V—r\ldots\ldots$$

অর্থাৎ r (লেখায় র-ফলা) পরে থাকলে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনটি উচ্চারণে ডবল হয়ে যাচ্ছে! এর অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে। পুত্র [পুৎ-ত্রো], ব্যাঘ্র [ব্যাগ্‌—ঘ্রো],[২৩] লোধ্র [লোদ্‌-ধ্রো], বিভ্রম [বিব্‌-ভ্রোম্‌] ইত্যাদির উচ্চারণ একটু খেয়াল করলেই এ ব্যাপারটা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত

ষ্ক-কারের উচ্চারণে এই দ্বিত্ব ঘটে না—কিন্তু তা বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ নয়। স্বাভাবিক 'আব্‌বৃত্তি'র সঙ্গে রাবীন্দ্রিক বা এখনকার বেশি সচেতন উচ্চারণ 'আবৃত্তি'-র তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট হবে।

র-ফলার আগে ব্যঞ্জনের এই ডবল হয়ে যাওয়ার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে অর্ধতৎসম বহু শব্দে। যদি দ্বিত্ব না ঘটত তাহলে 'পুত্তুর, 'শত্তুর', 'শুদ্দুর' 'মাত্তর', 'বেব্‌ভরম' 'শিগ্‌গির', 'শুক্কুর', 'বিক্কিরি', 'চক্কর,' ইত্যাদি রূপান্তর কখনোই ঘটত না, হত *পুতুর, *শতুর, *মাতর্ বা ঐ জাতীয় কিছু। এসব শব্দেও ধ্বনিপ্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত প্রথম ব্যঞ্জনটি ব্যাহত বা unreleased থাকে, কিন্তু পরবর্তী ব্যঞ্জনটি যৎসামান্য release পায়—কারণ তার উচ্চারণ সেরে জিভকে র-এর উচ্চারণ করতে ছুটতে হয়।

শব্দগঠনের সঙ্গে অক্ষরগঠনের তুলনা করলে দেখি, খাঁটি অর্থাৎ তদ্ভব বাংলা শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনওয়ালা কোভা নেই, বলা বাহুল্য তদ্ভব অক্ষরেও তা নেই। কিন্তু তৎসম অক্ষরে (অর্থাৎ নতুন শব্দঋণে) যেখানে যুক্তব্যঞ্জনওয়ালা কোভা আছে—যেমন 'ভৎ'সনা'-র 'ভৎ'-' 'সংস্কৃত'-র 'সংস্'-এ—rt, MS,—সেখানে সব তৎসম শব্দের শেষে এরকম জটিল কোভা থাকছে না, কেবল ইংরেজি তৎসম ছাড়া। ইংরেজি শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকে, সংস্কৃত শব্দের শেষে থাকে না, কাজেই এটা স্বাভাবিক। আবার শব্দ লেখ্যভাষায় আগে ধার নেওয়া হলে তার উচ্চারণ মূলের কাছাকাছি থাকে—বানান সেখানে উচ্চারণকে দূরস্ত রাখে—কাজেই ইংরেজি শব্দের শেষের অনেক যুক্তব্যঞ্জন, বাংলাভাষায় স্বভাব-বিরোধী হলেও, আমরা কষ্টেসৃষ্টে উচ্চারণ করতে শিখে গেছি। কিন্তু ফারসি শব্দের অধিকাংশের বেলায় তা হয় নি, কারণ বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফারসি ভাষায় শব্দ প্রথমে মুখের ভাষার মধ্য দিয়েই ঢুকেছিল, তা দরবারী ভাষা হওয়ার আগেই। কাজেই ফারসি শব্দান্তের যুক্তব্যঞ্জন স্বরযোগ করে দুই সিলেব্‌লে ভাগ করে, কখনো স্বরবিভাজিত করে, সহজ করে নিয়েছে বাঙালির জিভ—'শর্ত্' হয়েছে 'শর্তো', 'মর্দ্' হয়েছে 'মর্দ' (পরে 'মদ্দ'), 'ফুল্' হয়েছে 'ফুলুপ', 'দর্দ্' হয়েছে 'দরদ'।

যাই হোক, আমরা লক্ষ করি যে, শব্দের আদির যুক্তব্যঞ্জনে যদি তিনটি ব্যঞ্জন থাকে, তাহলে তার প্রথম ে টি হবে অবশ্যই 'স্' দ্বিতীয়টি একটি অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্টব্যঞ্জন এবং তৃতীয়টি 'র্'। আর শব্দের আদিতে দুই সদস্যের

যুক্তব্যঞ্জনে প্রথম ে-টি হতে পারে নিচের বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি

ক্, খ্, গ্, ঘ্, জ্, ট্, ড্ ত্,
থ্, দ্, ধ্, প্, ফ্ [ইংরেজি থেকে ঋণে], ব্, ভ্, ম্, স্, হ্।

ঐ ধরনের যুক্তব্যঞ্জনের [শব্দের আদিস্থ ে-র] দ্বিতীয় সদস্য হতে পারে এই ব্যঞ্জনগুলি

ক [স্কন্দ], খ [স্খলন], ট [স্টাইল],
ত [স্তুতি], থ [স্থান], ন [স্নান],
প [স্পর্ধা], ফ [স্ফুরণ], ম [স্মার্ট],
র [গ্রাম], ল [গ্লানি]।

কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, এই শব্দের প্রারম্ভের ে-র প্রথমটি 'স্' হলে দ্বিতীয়টি একটি অঘোষ স্পৃষ্টব্যঞ্জন [stop] হবে, না হয় 'ন' আর 'ম' এই দুটি পূর্ণাঙ্গ নাসিক্যব্যঞ্জন হবে। আর প্রথমটি যদি একটি স্পৃষ্টব্যঞ্জন হয় তাহলে দ্বিতীয়টি অনাসিক্য অন্তরণিত [sonorant], অর্থাৎ 'র' বা 'ল'। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, একটা সিলেবলে যে যুক্তব্যঞ্জন পাব সেটাই যথার্থ যুক্তব্যঞ্জন। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিসদস্যরা যদি দুটি সিলেবলে এক এক করে ভাগ হয়ে যায় তাহলে তাদের যুক্তব্যঞ্জনরূপে গ্রাহ্য করার অসুবিধে আছে। যুগ্মব্যঞ্জনে যেখানে জিহ্বার বিরতি বা release ঘটছে না—অর্থাৎ একই ব্যঞ্জনের দীর্ঘত্ব ঘটছে—সেখানে যুগ্মব্যঞ্জনকেও বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়।

আর যে-কথাটা সর্বত্র স্মরণ রাখা দরকার তা এই যে, খাঁটি বাংলা—যে-বাংলা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে—যুক্তব্যঞ্জন তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। সেইজন্যই ঐ 'প্রাকৃত বাংলা'য় যুক্তব্যঞ্জন ঢালাও ভাবে সরল করা হয়ে থাকে নানা স্বরধ্বনির সহায়তায়। তার প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা অনুত্তই করা সংগত এখানে নয়। সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, তদ্ভব স্তরে যুক্তব্যঞ্জনের আগে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনি বসিয়ে নতুন সিলেব্‌ল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে CV গড়নের সিলেব্‌ল তৈরি করা হয়। যেমন স্টেশন→ইস্টিশন, এখানে CC→VCC [স্বরাগম]; আবার ব্লাউজ→বেলাউজ, গ্রাম→গেরাম—এখানে CC→CVC [স্বরভক্তি]; এবং বক্স→বাকসো, শর্ত→শর্ত, এখানে CC→CCV [অন্ত্য-

স্বরাগম]। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে একটি করে CV অক্ষর তৈরি হয়ে বাংলা ভাষার পছন্দসই গড়নের সিলেব্‌লকেই বাড়িয়ে তুলছে।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে দ্বিমাত্রিকতা বা bimorism নামে যে প্রসিদ্ধ নিয়মটি 'গামোছা'-কে 'গাম্‌ছা' এবং 'জানালা'কে 'জান্‌লা' করে—তা আমার ধারণা একটি syllable counting rule, অর্থাৎ শব্দে সিলেবল একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে গেলে তা একটা সিলেব্‌ল ছেঁটে ফেলে দেয়। এ সম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান করবার আছে। অ্যাণ্ডারসন মাহাকালি (Maxakali) ইত্যাদি নানা ভাষায় এ ধরনের অক্ষরনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি-নিয়মের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন[২৪]। তাঁর ইঙ্গিত ধরে বাংলার নিয়মগুলি সম্বন্ধেও আরো অনুসন্ধান চালানো দরকার*।

---

* কমপিউটারের সাহায্যে বাংলা সিলেবল বিষয় আরো ব্যাপক খোঁজ খবরের একটি পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। দ্বিতীয়ত, এ লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র পূর্বে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু এটি প্রায় নতুন লেখা।

টীকা ও উৎসনির্দেশ

১. দুটি বইয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনার বিস্তারিত তালিকা দ্রষ্টব্য : Allen, W. Sidney, 1973, *Accent and Rhythm. Prosodic Features of Latin and Greek* etc., Cambridge Studies in Linguistics/12, Cambridge University Press, এবং Pulgram, Ernst, 1970, *Syllable, Word, Nexus, Cursus*, The Hague, Mouton.

২. এ প্রবন্ধে 'অক্ষর' ও 'সিলেব্‌ল' শব্দদুটি সমার্থক। 'শব্দ' কেবল word বোঝাবে, ধ্বনি sound।

৩. যেমন Pancocelli-Calzia এবং von Essen। von Essen তাঁর *Zeitschrift fur Phonetik*, V, (1951) গ্রন্থে বলেছেন "die Silbe ist uberhaupt kein phonetisches Element", অর্থাৎ সিলেব্‌ল জিনিশটির কোনো ধ্বনিগত ভিত্তি নেই। দ্রষ্টব্য Malmberg, Bertil, 1955, "The Phonetic Basis for Syllable Division", in *Studia Linguistica*, vol. 9, (Lund, Sweden), P. 81.

৪. উপরিউক্ত প্রবন্ধ, p. 87.

৫. আমরা বলছি 'সাধারণভাবে'—অর্থাৎ এর ব্যতিক্রমও ক্বচিৎ লক্ষ করা যায়। যে-সব ধ্বনিকে অনুরণিত বা Sonorant বলা হয়, সেগুলিও অক্ষর রচনা করতে পারে। যেমন ইংরেজিতে mutton-এর [n], bottle-এর [l] এবং bottom-এর [m]। ফারসিতে অ্যাব্‌র্ (মেঘ)-এর [র্]। শিস্ ধ্বনিরও এ ক্ষমতা আছে। বাংলায় অভিধান-বদ্ধ শব্দাবলিতে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নেই। তবে স্বীকৃতিসূচক অব্যয় 'নুম্‌ন্' বা পায়রার ডাকের ধ্বনিগত অনুকরণ 'বকুবকুম্'-এ [ম্] অনেকটা আক্ষরিক বা Syllabic। তবে এও ঠিক যে, ইংরেজিতেও, যে-শব্দে ঐ অনুরণিত ধ্বনির অক্ষর আছে তাতে স্বরভিত্তিক অন্তত আরেকটি অক্ষর থাকতেই হবে। শুধু অনুরণিত বা শিস ধ্বনির অক্ষর দিয়ে তৈরি শব্দ অভিধানে নেই,—ধ্বন্যাত্মক ইঙ্গিত ছাড়া।

৬. Pike, Kenneth L., and Eunice Pike, 1947, "Immedate Constituents of Mazateco Syllables", *International Journal of American Linguistics*, No. 13. pp. 78-91.

৭. CV-ধরনের Syllable-ই মামবার্গের ভাষায়…"represent the most primitive, and without doubt historically the oldest, of all syllable types, the only one which is general in all languages." দ্র. Malmberg, Bertil, 1963, *Structural Linguistics and Human Communication* etc , Berlin, Springer-Vertag, p. 129.

৮. দ্র. Abercrombie, David, 1967, *Elements of General Phonetics*, Chicago, Aldine Publishing Company, p. 75.

৯. দ্রষ্টব্য Pike, Kenneth. L., *Phonetics*, 1943, Ann Arbor, University of Michigan Press, p. 116. স্টেটসন (Stetson, R.H.) তাঁর *Motor Phonetics* [2nd Edn., 1951, Amsterdam] বইয়ে এই মত প্রথমে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ল্যাডেফোগেড পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, দমের ধাক্কার সঙ্গে অক্ষর উচ্চারণের কোনো সমান্তরাল সম্পর্ক নেই। তাঁর কথায় "It is quite clear that there is no simple correlation between intercos-

tal activity and syllables."…দ্রষ্টব্য : Ladefoged, Peter, 1967, *Three Areas of Experimental Phonetics*, London, Oxford Univ. Press. pp. 18-25.

১০. দ্রষ্টব্য Greenberg, Joseph H., *Essays in Linguistics*, 1957, Chicago, University of Chicago Press, p. 87.

১১. এটি আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এই প্রবন্ধের শেষদিকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু যুক্তিও থাকছে। ভিন্নধরনের সিদ্ধান্তের জন্য দ্রষ্টব্য Chatterji, S.K., "Bengali Phonetics," *Bulletin of the School of Oriental Studies*, vol. II, Pt. I, 1921, pp. 1-25 ; Ferguson, Charles A., and Chowdhury, Munier, 1960, "The Phonemes of Bengali", in *Language*, vol. 36. 1, pp. 22-59 ; মুহম্মদ আবদুল হাই, **ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব** (১৯৭৫. তৃতীয় মুদ্রণ), ঢাকা, 'বর্ণমিছিল', পৃষ্ঠা ১৩—১০৭ ; Ray, Punya Sloka, Hai, Muhammad Abdul and Ray, Lila, *Bengali Language Handbook*, 1966, Washington, Center for Applied Linguistics, pp. 4—6.

১২. দ্রষ্টব্য : Ladefoged, Peter, 1968, *A Phonetic Study of West African Languages*, Cambridge, at the Uuiversity Press, pp. 5—13

১৩. অটো ইয়েসপার্সন (Jespersen, Otto) ইংরেজিকে বলেছেন পৌরুষ গুণান্বিত, প্রাপ্তবয়স্কের ভাষা [দ্রষ্টব্য : *Growth and Structure of the English Language*, Ninth Edition, Oxford University Press (Indian Branch) pp. 2] । তাঁর যুক্তির মধ্যে যেটুকু বৈজ্ঞানিক সেটুকু ইংরেজি ভাষার অক্ষরের গড়ন ও শব্দগঠনের চরিত্র সংক্রান্ত।

১৪. আমার মতে তৎসম কথাটিকে শুধু সংস্কৃত থেকে ধার করা এবং উচ্চারণের দিক থেকে ন্যূনতম ভাবে পরিবর্তিত শব্দাবলির বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখা নিরর্থক। 'অর্ধতৎসম' কথাটিও এভাবে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ সংস্কৃত, ইংরেজি, ফারসি—যে-ভাষা থেকেই শব্দ আসুক না কেন, বাংলায় কতকগুলি নির্দিষ্ট রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেলে বা পরিবর্তিত হলে 'তৎসম', তার বেশি পরিবর্তন ঘটলে অর্ধতৎসম,

তারও বেশি পরিবর্তিত হলে 'তদ্ভব'। যেমন—'স্কুল' ইংরেজি তৎসম, কিন্তু 'ইস্কুল' অর্ধতৎসম। আমি আরেকটি প্রস্তুয়মান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলবার চেষ্টা করছি।

১৫. হাই তাঁর *A Study of Na als and Nasalization in Bengali* (Univ. of Dacca, 1960) গ্রন্থে বলেছেন (p. 68) —CC-তে শেষ হচ্ছে এমন অক্ষর বাংলায় নেই। দেখাই যাচ্ছে তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

১৬. দ্র : মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব,' (১৯৭৮ সংস্করণ, ঢাকা, 'বর্ণমছিল', ২৯ পৃষ্ঠা)। আরো দ্রষ্টব্য. Abercrombie,1967…"No harm is done by thinking of a diphthong as a sequence of two vowels, provided it is remembered that they occupy only one syllable." [*Elements of General Phonetics* Chicago, Aldine Pub. Co., P 60]

১৭. Bloch, B. & Trager, George L., *Outline of Linguistic Analysis*, 1942, Baltimore, Special Publications of the Linguistic Society of America, p. 23.

১৮. *e* চিহ্নে হসন্ত-'য়' বোঝানো হচ্ছে। এর পিছনে ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের যুক্তি আছে, কিন্তু সেগুলি আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই।

১৯. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ৩২ পৃষ্ঠা।

২০. অন্নদাশংকর রায় ছড়ায় 'ইয়াহিয়া' থেকে 'এহিয়া' করেছেন, ছন্দাহুরোধে। 'শালিধানের চিঁড়ে'; ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৩৭৯; ৫৫ পৃষ্ঠা।

২১. বাংলায় এই অর্ধস্বরগুলিকে স্বাধীন ফোনিম বলে গণ্য করা যায় বলে আমার মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আমার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭৫) ভাষাতত্ত্ব বিভাগে প্রস্তুত করা Ph. D.-র অপ্রকাশিত থিসিস 'The Generative Phonology of Bengali-'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে সম্যক আলোচনা আছে।

২২. বক্রবন্ধনীর (=।।) ভিতর উপরে নিচে যা থাকে তা পরস্পরের বিকল্প, অর্থাৎ একটা থাকলে আরেকটা থাকবেনা।

২৩. মহাপ্রাণ দ্বিত্ব হলে একই বর্গের (homorganic) সমজাতীয় (অঘোষ / ঘোষবৎ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি তার আগে এসে বসে। এটা ধ্বনি বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম (universal phonetic constraint)। কাজেই 'ধ্ধ' দ্বিত্ব হলে হয় 'দ্ধ'। Release না হলে মহাপ্রাণত্ব স্পষ্ট হয় না।

২৪. দ্র. Anderson, Stephen R., 1973, *The Organization of Phonology*, New York, Academic Press, pp.252-281.

কমল চক্রবর্তীর কবিতা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কমল চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পূরবী। পূরবী মুখোপাধ্যায়, যে নাকি জামশেদপুর আর কলকাতার যোগসূত্র ছিল। গত বছর অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পূরবী আমাদের ছেড়ে গেছে, নইলে বিভাবে কমল চক্রবর্তীর ওপর লেখবার হক তারই ছিল। আমি এ ব্যাপারে বদলী খেলোয়াড়।

কমল চক্রবর্তী বাংলা কবিতাতে নূতন এক স্বাদ আর গন্ধ এনেছেন। গদ্যে এ কাজ অনেক আগেই হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের 'আরণ্যক' উপহার দিয়ে বাংলা গদ্যে লবটুলিয়াকে অনবদ্য ভাবে ফুটিয়ে গেছেন। তারও আগে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমভ্রাতা) পালামৌ-এর বর্ণনায় এ কাজ করেছেন। এঁদের নামের পাশে কমল চক্রবর্তীর নাম করলে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে লজ্জা পাবেন। কিন্তু পূরবী যখন ওর কবিতা পড়িয়ে শুনিয়েছিল তখন আমার সিংভূমের ছোঁয়া-লাগা সেই কবিতা খুব আনন্দ দিয়েছিল।

তুমার ডেরায় টাটা বাবা
তিন পুরুষের উঠা বসা খাওয়া
সাঁঝের বেলায় কুঁকড়া লড়াই
রেত বিরেতে মহুয়া বনে শুয়া

কেঁদ গাছেতে লাগল আগুন
রানীক্ষেতে দুখার মায়ের বুক

পটমদার হাটের দিনে
চালের সাথে বিকে দিল সুখ।

টাটা বাবা আগুন দিলে
লোহা লিলে
দুখার মায়ের বুকের থিকে
মহুয়া গাছের ছায়া লিলে কেন?
বিয়ান বেলায় উঠে দেখি
পালক মেলা পইরে আছে
কুঁকড়া দুটি নাই সেঠিনে কেন?

এটি কমল চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই 'চারনম্বর ফার্নেস চার্জড'-এর প্রথম কবিতা। খাঁটি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে বেরিয়েছে সিংভূমের মুরমু আর হো, কোল আর ভীলেদের মর্মকথা। কোম্পানি টাউন জামশেদপুরের থাক ভাগ করা সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ে এবং সেই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে ফার্নেসের পাশে কাজ করতে করতে কমলের হাত দিয়ে এই কবিতা বেরিয়েছে। সেদিন মনে হয়েছিল এই কবির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। এখনো সেই মত আমি বদলাই নি। তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। কমলরা কৌরব বলে একটি গোষ্ঠী গঠন করেছেন। কমল আর তাঁর বন্ধুরা বিদ্রোহী। ভেবেছিলেন বোধহয় কৌরব নামটা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই অপাঙ্‌ক্তেয় নাম গ্রহণ করে সমাজকে চোখ রাঙাতে চেয়েছিলেন। বেচারারা জানতেন না কুরুবংশের লোক পাণ্ডবরাও, সুতরাং ভাবনাটা ঠিক নয়। আর যদি মনে করে থাকেন তাঁরা হারবার নিয়তি নিয়ে জন্মেছেন তাহলেও নামকরণ বোধহয় সার্থক নয়। কৌরব গোষ্ঠী একই নামে একটি পত্রিকা বের করে। এক দশকের ওপর বের হচ্ছে। ২৫ নম্বর সংখ্যা বেরোবার মুখে। কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনদের মধ্যে খুব কম পত্রিকা এ গৌরব করতে পারে। ওঁরা শেষ পর্যন্ত হারবেন কি না জানি না কিন্তু ঢাল-তরোয়াল বিহীন কৌরব বাহিনীর লড়াই করবার ক্ষমতা অসীম।

আর এই লড়াই করতে করতেই কমলের লড়ুয়ে রোমান্টিক মেজাজ খানিকটা বদলেছে। কমল বলেছেন

মাছের জন্য কোন লড়াই দিইনি কোনদিন
আমার লড়াই শুধু ডাল ভাত

তারপর ছুটি। ছুটি ছুটি ছুটি
তোমার পায়ের কাছে লুটোপুটি করে মরে যাব।
আমাকে ওভারটাইম দিতে চাস। নাট বোল্টে আঁটা তরোয়াল
কি হবে ইলিশ চেখে, একটা জীবন শুধু মুসুরে প্রোটিন বুঝে যাই।
(কবিতাগ্রন্থ 'জল', কবিতার নাম "ছুটি" পৃঃ ৬০)

কমল জানেন লড়াইটা কত তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য, তবু তিনি লড়াই চালাবেন। তাঁর জানা হয়ে গেছে "আমি সাধারণ নাগরিক যাকে ভোট দিই সে কখনো মন্ত্রী হয় না, যাকে ভালবাসি তার রোগ হয়, ক্যানসার এটা সেটা নিরাময়হীন, যাকে নদী ভাবি সে আসে ভূতের মতো" (ঐ, "ভুবনসম্রাট", পৃঃ ৫২)। তুচ্ছতাকে মেনে নিতে তাঁর দ্বিধা নেই, কিন্তু লড়াইয়ে তার জন্য কোন ক্ষান্তি নেই।

কমল অশান্তের মতো ঘুরে বেড়ান। প্রকৃতি তাঁকে টানে, প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়া লোকগুলি তাঁকে ভালবাসার নূতন মানে এনে দেয়। বাঘমুণ্ডি আর অযোধ্যা পাহাড়, পটমদা আর বুণ্ডু, ডুলং নদী আর রোরো নদী ওঁকে খুশি করে। সেই খুশি আর ভালবাসাও যেমন কবিতাতে আসে তেমনি আসে ওই অসহায় মানুষগুলি। আর সেই জায়গা থেকে কমল দেখেন কলকাতার আর আমেরিকার, দিল্লীর আর আফ্রিকার স্বার্থপর ধান্দাবাজ মানুষগুলিকে। কী মনে হয় তাঁর, সঙ্গের কবিতাগুলি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আমার এই ক্রোধের অভিব্যক্তি নিয়ে একটু অসুবিধা আছে। আমি অকপটে স্বীকার করছি আমি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় বড় হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ আমার আদর্শ। খালাসিটোলা চিনিনা, সেখান থেকে যে সব কবিরা বেরিয়েছেন কমল তাঁদের অনেককে হয়তো প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন। তাই হয় তো ওঁর কবিতাতে মাঝে মাঝেই লিঙ্গ যোনি প্রভৃতি প্রত্যঙ্গের বর্ণনা এসে যায়। স্বাধীন দেশে অবশ্য ওঁর যা খুশি করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু কমলও তো স্বাধীন। কমলের জার্সি পরার প্রয়োজন নেই। কমল এমনিতেই শক্তিশালী কবি।

বিদ্রোহীরা সাধারণত রোমান্টিক হন। কমলও তার ব্যতিক্রম নন। এবং গাঁজা, চরস, যুবতী ইত্যাদির ছড়াছড়ির মধ্যেও সেই রোমান্টিক চোখ আর মনটা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমাণ সঙ্গেই রয়েছে।

কমল চক্রবর্তীর আটটি কবিতা

স্মাগলার

সারা জঙ্গলে সে সোনার বাঁট ছড়িয়ে দিয়ে যাবে
কাশ্মীরী চরসের গন্ধে বিগত যুদ্ধের এই ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে বুনো টাঁড়ে
চকলেট মোদক এনেছে স্মাগলার
নেপালী গাঁজার খুঁদ ফেরাতে পারবেনা কোনদিন
স্মাগলার, ও আমাদের চেনা স্মাগলার
পুলিশ খুঁজছে যাকে রাইফেলে, বেয়নেটে, উনিশশো আশির লক্ষ্য মাত্রায়
হেগেলের গুপ্তচর ভাই জেগে উঠে একা পথ চলে, একা ব্যারাক পেরিয়ে যায়
গোপন তুর্কীর তাঁবু মধ্যরাতে ফেলে চলে যায়

সারা জঙ্গলে একা রুকস্তাকে পাতা ভরে নেয়, শুকনো খয়ের ফুল
লোকাচার ছিন্ন করে সমাধির নির্জনতায় সঙ্গম করেছে সারা রাত
জামায়, অস্তিনে, চোরা খাঁজে, ভূত নিয়ে যাবে
শুকনো পাতায় ছিন্ন মালতীরা, গাঢ় রজনের লতা
বাঘনখ, শুয়োরের-চর্বি মাখা হাত সমস্ত শাসন টেক্কা দিয়ে
সে সারাবেলা রেস্তোরাঁয় অবাঞ্ছিত চোরা কারবারী
হাশিসের মত দীর্ঘ চোখ কেউ জানতে পারবে না রাজদ্রোহী।

মানুষের মাংস খাওয়া হয়

ইদি আমিনের বদলে প্রফেসার ইউসুফ লুলে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন
মানুষ খাওয়ার ইতিহাস বদলায় নি
যেমন রোডেসিয়ায় মাছের মত মানুষ গেঁথে শুকানো হয়।

ননভেজ যুবতী থুথু ছেটালো প্রকৃতির দিকে
সে পুঁইমাচা ঢ্যাঁড়স-চচ্চড়ি কোনদিন ছুঁয়েও দেখবেনা
কত রাতে নটে শাকে কাঁচ পোকা হেঁটে যায়
জোয়ারী রুটির মত লাল গণ্ডদেশ, কেউ একা রণক্লান্ত নয়
হ্যাম বেকনের মত সারাদিন ঠোঁট থেকে ঠোঁটে একা একা

কেউ জানবে না মানুষের মৃতদেহে শকুন বসার মত সত্যি কথা
বড় বেশী পৃথিবীতে নেই
মদেও সংকর চলে, শাড়ির ওপাশে হয়ত ঘিয়ে ভাজা চিকেন রয়েছে
বড় মাংসময় ঠ্যাং
ছিন্ন ভুলে যাও বিচ্ছিন্ন আরও তাড়াতাড়ি ভুলে যাও
ঐ যে ললিতকলা মৃতদেহ, আমার চোখের মতই কতকাল সত্য হয়ে আছে।

অপারেশন বর্গা

মাজরা পোকার মত বর্গাদার ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে।
ধানে যখন ফুল হয়, ফল হয়, অনেক কাল গ্রামের বাতাস গ্রামে থাকেনা
গ্রামের পুব পাড়ায় বুড়ো শিব, পশ্চিমে সাঁকোর ওপরে
প্যারী কমিউনের স্বপ্নে ডগমগ বাংলা ভাটির খয়েরী বোতল
মাছধরা জালের তৈরী স্লিভলেস ব্লাউজ পরে চাষী বৌ
মিটিং শুনতে এসেছে
ফলিডলের বদলে কোকাকোলা ঢেলে দাও অভিমানিনীর রাঙা ঠোঁটে

বরগাদার খুঁজতে জোতদারের দাদা পর-দাদা সর্কি হাতে
অপারেশনে বেরিয়েছে
কানুনগোর দিশি কুত্তা দিনের বেলায় মশা তাড়াবার ভঙ্গিতে ঘেউ ঘেউ করল
কুকুরের লেজের চেয়েও কড়া দিশি মদে চোবানো গলা
সারা বিলে পদ্মফুল ফুটে কমিউনের ঢংএ আকাশ মাতিয়ে তুলেছে
কেউ কাউকে আর কোনদিন দেখতে পাবেনা, সবাই গেরিলা হয়ে যাচ্ছে।
অপারেশন চলছে টেবিলে টেবিলে মানুষে মুৎসুদ্দীতে
যারা আগে খরা দেখলে ভয় পেত, তারা এখন
মানুষ দেখলে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ছে।

লাল টমাটো কালা আদমী

টমাটো বাগানে কালা আদমী ঢুকে পড়েছে
কালা আদমীর হ্যাট কোট পায়ে চপ্ চপ্ জুতো

জুতোর পেরেক, নাল, লোহালক্কর, কাস্টআয়রনের ধুলো
বন্ধ ঘড়ির অন্ধকার
দিশি অ্যালকোহল পরদেশি চুরুট, চুট্টা, থেকশিয়াল
সব ভেঙে তুবড়ে ঢুকে পড়েছে

লোডশেডিংএ টমাটোতে হাত বোলানো আদমীর অভ্যাস
কেউ দেখেনা বলে জুতো জামা প্যান্ট
জামার পকেটে গেটপাস
প্যান্টের পকেটে ঘামে ভেজা রুমাল
বুকের হাড়ে কুড়ি বছর আগেকার দুব্বোর মত গজিয়ে ওঠা চুল
তিন সেট আমেরিকান গ্রেহাউণ্ড কে ডিভি মেরে, ঢুকে পড়েছে

কালা আদমীর মোচ দাড়ি চোখের তারা কুচকুচে
হাত পা নখ চুলের ডগা চোখে দেখা যায়না
ধমনীতন্ত্র, রক্ত, থুথু, বীর্য, চোখের জল
কালো আলকাতরার মত গড়িয়ে পড়েছে
কালা আদমী কয়লাখনির মত বড় হাঁ করে
হাসতে হাসতে লাল টমাটো বাগানে ঢুকে পড়েছে।

কয়েকটি অশ্লীল দৃশ্য

অনেকগুলি লাল টুকটুকে আপেলের পাশে একটা চকচকে
খোলা ছুরি পড়ে আছে
এই যৌন দৃশ্যটি দেখে শিউরে উঠলাম
কতকাল আগে একটা খোলা সিঁদুরের কৌটা দেখে এমনি চমকে উঠেছিলাম

কলমে বসানো বোঁটা শুদ্ধু পদ্মফুলের মাথায় কালো চকচকে ভ্রমর
কালো ভ্রমরের পায়ে পরানো লাল আদ্দির মোজা
আমার প্রথম যৌবনের পাগলা ছবি

গর্ব করে বলা যায় একবার আমি মাখনের বাটিতে
একটা শুকনো ফুল ঝরে পড়তে দেখেছিলাম
নতুন বই-এর গভীর দুই পৃষ্ঠা
এক বর্ষার দুপুরে জানালার পাশে খোলা পড়েছিল
আর গোপন বৃষ্টির ফোঁটা।

আমাদের প্রেস নেই সেক্সি যুবতী নেই

আমাদের প্রেস নেই সেক্সি যুবতী নেই
হায় ঈশ্বর! সভ্য মানুষকে প্রেস দাও, হাফটোন ব্লক দাও অফুরন্ত কাম দাও
লৌহ দণ্ড নির্মিত সাবেক কালের ভালোবাসা, হারিয়ে যেওনা
আধ ময়লা অষ্টধাতুর গণপতি হে, সমস্ত তাক ডুমা ডুম ফিরিয়ে দাও
আজও এই গলি দিয়ে মিউনিসিপালিটির বলদ-টানা গাড়ি চলে গেছে
উঁচু গাছের বদলে এ্যান্টেনা
হয়ত একদিন চোখেব জলে পাতা বেরুবে, লোহার বিষ্ণুনিতে পাখি
অফসেটের কোন বিকল্প নেই শুধু শেষ রাতে জানলা ফাটিয়ে চাঁদ নামে

কত লক্ষ লক্ষ মানুষ টোটার মুখে ছাতু হয়ে গেছে
তবু পাউণ্ড পাউণ্ড ম্যাপলিথো, কি জগৎবিখ্যাত ছেনালিপনা
সাদা কাগজে চোখের জলে ভেজা স্মল পাইকা লাফিয়ে নামছে
সাদা কাগজে কাম-টলমলে-মেয়ে মানুষ খালি গা হয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে
আমাদের লিটল ম্যাগাজিন নেই

পুরুষ

ভালবাসায় ছিলাম, অভিমানে ছিলাম।
কখনও লোহার বালা পরানো একখানা ঠাণ্ডা হাত
কখনও ছাপাখানার অন্ধকারে পূর্ণযুবতীর চোখের জল
আয়নার পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠেছি 'পালাও'
কেঁদ ফুল ফুটেছে আদিবাসীরা শিকারে বেরুবে।

কতকাল আগে খনি, খনির ভেতরে তোরঙ্গ
তোরঙ্গের মধ্যে হাতীর দাঁতের মত সন্ধেবেলা
কতকাল আগে ইটের চেয়েও কাছে দাঁড়াতো মানুষ
কাগজের চেয়েও দীর্ঘ ছিল রতি

ঐ হাতলভাঙা চেয়ারের সর্বসত্য আমার, আমার উত্তরাধিকার
আমি কখনও উপনির্বাচনে দাঁড়াবো না দেখে নিও
বর্ষাকালে আমি বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমে যাব না
এমনকি মরে যাবার পরও নয়

ছেঁড়া জুতোর শুকতলায় ছাতা পড়বে
ধোঁকার টাটি এক বাটি জলমেশানো দুধ পত পত করে
উড়ে বেড়াবে সারা আকাশ
আমি গুরুবংশের শেষ পুরুষ তাম্রকুণ্ড দিয়ে এ্যাশট্রে করেছি
বেশ্যার নতুন কেনা সায়ায় সুত্‌লির বদলে পৈতে ভরে দিয়েছিলাম

সহজ হাঁড়িয়া প্রস্তুত প্রণালী

হাঁড়িয়া এক ধরনের ভাত পচানো দিশি মদ।
সাঁওতাল যুবতীরা শাল বনের হাওয়ায় ভাতগুলি মেলে দিয়ে
ঝরনায় জল আনতে যায়
এরা ষোল থেকে কুড়ি, প্রোষিতভর্তৃকা হলে কিছু শিথিলতা কিম্বা কষি রাঁড়
অতি ব্যবহৃত স্তন, যোনদেশ রহস্য হারিয়ে শ্লথ হয়
ঢিলে লটপটে সেই রমণীরা কূট ও তর্জমাকারী, হাঁড়িয়ার
লাবণ্য তারা ছুঁতেই পারেনা
এ্যালকোহলে মজা-স্রাব তৈরী করে ফেলে।

হাঁড়িয়া এক ধরনের সোমরস
যুবতী সাঁওতাল হেসে ডুলুং এর জলে স্নান করে
সোনালী রূপোলী রেখায় মেটে হাঁড়ি ভরে যায়

তখন ডুবাং-এর জন্য দুর্মর ঘূর্নির মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন যুবতীরা
তখন ভারী গদগদে চাঁদ ধমসার শব্দে টাল খায়
তখন রাগী পুরুষেরা পাহাড়ে আগুন দিয়ে ফেরে
তখন কুমারীরা, যুবতীরা, রমণীরা হাঁড়িয়ার জন্য
ঈশ্বরের কাছে নত হয়
পাহাড়ী গুলাচ গুল্ম বনভূমি, বনবিড়ালী হিংস্র লাফ মেরে ভুবন পেরোয়
অনেক প্রাচীন আত্মা, কিছু ভালোবাসা
সিংবোঙ্গা বুক চিরে দুফোঁটা রক্ত ফেলে দেয়
মদ তৈরী হয়
হাঁড়িয়ার জ্বালাগুলি কোনদিন শূন্য থাকেনা
আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অস্বীকার করছি।

পুরনো

আচার্য লালবিহারী দে

রাধারমণ মিত্র

লেখকের নিবেদন : [অনেকদিন আগের কথা। যতদূর মনে পড়ে বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী গ্রামের লালবিহারী দে-র জন্মভিটায় ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম তাঁর স্মৃতিসভা হয়। এই সভার অনুষ্ঠান করেন নিকটবর্তী কুরমুন গ্রামের মরহুম জাহেদ আলি সাহেব। কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন, যথা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্কটিশচার্চ কলেজের শেষ শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জন কেলাস। এঁরা সকলেই লালবিহারী সম্পর্কে কিছু কিছু বলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। আমিও সে সভায় উপস্থিত ছিলাম; আমাকেও কিছু বলতে হয়েছিল। পরের বছর বর্ধমান থেকে প্রকাশিত "নতুন পত্রিকা"-র সম্পাদক মণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে লালবিহারী দে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি লিখি। লেখাটি ঐ পত্রিকার ১৯৫৩-সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাড়াহুড়ো করে ছাপার দরুন প্রবন্ধটিতে অসম্ভব ছাপার ভুল ছিল, এমনকি মাঝে মাঝে লাইনও ছাড় পড়ে গিয়েছিল। এক কথায় প্রবন্ধটি পাঠকগণের পক্ষে প্রায় অপাঠ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পত্রিকার অস্তিত্ব বহুকাল আগেই লুপ্ত হয়েছিল। এরপর "নন্দন" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আগ্রহ সহকারে প্রবন্ধটি ঐ পত্রিকার বাংলা ১৩৮১ সনের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় (ইং-১৯৭৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায়) পুনর্মুদ্রিত করেন। কিন্তু "নতুন পত্রিকা" থেকে ছাপানো হয় বলে এবারও প্রচুর ছাপার ভুল থেকে যায়। তাই "বিভাব" পত্রিকাকে সেই প্রবন্ধটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে দিলাম এই আশা করে যে, তাঁরা এবার নির্ভুল ভাবে ছাপবেন।]

বাংলাদেশের উজ্জ্বল রত্ন—বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট গৌরব—আচার্য লালবিহারী দে। মাত্র ঊনষাট বছর আগে তিনি মারা যান, অথচ এরই মধ্যে আমরা তাঁকে ভুলে গিয়েছি বললেও অত্যুক্তি হবেনা। যেখানে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন সেই স্কটিশচার্চকলেজের হল ঘরে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু ও প্রাক্তন

ছাত্রগণ তাঁর এক মর্মর স্মৃতিফলক স্থাপন করেছেন। বাংলার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় স্বধর্মী মনীষীর প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। লালবিহারীর মধ্যম কন্যা কুমারী এ্যালিস বি. দে মৃত্যুর সময় পূর্বোক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জন কেলাস সাহেবের হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, নিজ বিবেচনা-মতো পিতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু বাংলার জনসাধারণ কিংবা তাঁর জেলাবাসিগণ এ যাবৎ তাঁর প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করেননি। মনে হয়, এই মানুষটির প্রতি তাঁদের যে কোনো কর্তব্য আছে এ চেতনাও সাধারণ-ভাবে তাঁদের মধ্যে ছিল না। সুখের বিষয় ইদানিং এই বোধটি অন্তত তাঁর জেলাবাসী-দের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। তাই গত দুবছর থেকে তাঁরা লালবিহারীর স্বগ্রামে তাঁর জন্মদিনে স্মৃতিসভা করে আসছেন এবং পৈত্রিক ভিটায় স্মৃতিবেদী স্থাপন করে ও অন্যান্য উপায়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার প্রচেষ্টা করছেন। তিন মাস পরে আবার তাঁর জন্মবার্ষিকী পালিত হবার সময় উপস্থিত হবে। তারও আগে ২৮শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যুর ঊনষাট বৎসর পূর্ণ হবে। এই দুই ঘটনার প্রাক্কালে তাঁর জীবন কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বর্ধমান সহর থেকে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে সোনাপলাশী গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর লালবিহারীর জন্ম হয়। জাতিতে তিনি সুবর্ণবণিক—বংশগত উপাধি 'দে', নবাব-দত্ত উপাধি 'মণ্ডল'। তাঁর পূর্বপুরুষের বাস এই গ্রামে, আবার তাঁর মামার বাড়িও এই গ্রামে। এখনো এই গ্রামে তাঁর ভগ্ন পৈত্রিক ভিটা "মণ্ডলবাটি" ও "মণ্ডলপুকুর" ও "দে-পুকুর" বর্তমান।

তাঁর গ্রামের নাম নিয়ে অনেকদিন ধরে একটা গণ্ডগোল চলে আসছিল। লালবিহারী নিজেই এই গণ্ডগোলের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর নিজের পত্রিকা "বেঙ্গল ম্যাগাজিন"-এ তিনি ছদ্মনামে যে-বাল্যস্মৃতি লিখেছিলেন তাতে তিনি স্বগ্রামের নাম দিয়েছিলেন "তালপুর"। তাঁর কথা বিশ্বাস করে ম্যাক্‌ফারসন সাহেবও লাল-বিহারীর ইংরেজী জীবনচরিতে এই গ্রাম "তালপুর" নামেই উল্লেখ করেছেন। ম্যাক্‌ফারসনকে অনুসরণ করে তাঁর যে-স্মৃতিফলক পরবর্তী কালে স্কটিশচার্চ কলেজে স্থাপিত হয় তাতেও গ্রামের নাম দেওয়া ছিল "তালপুর"। যদিও নানা যুক্তিতর্ক ও দলিলের ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, "তালপুর" নামে বর্ধমান জেলায় কোনো গ্রাম নেই, সোনাপলাশী গ্রামই লালবিহারীর জন্মস্থান, ও এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে কলেজের স্মৃতিফলকে গ্রামের নাম দেড় বৎসর পূর্বে সংশোধন করা হয়েছিল, তবুও যেন একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে

গিয়েছিল। সম্প্রতি বেঙ্গল ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে লালবিহারী নিজের নাম দিয়ে স্পষ্ট লিখেছেন যে, তিনি জন্মেছেন সোনাপলাশী গ্রামে। সুতরাং তিনি নিজে যে-সন্দেহ ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন, শেষে নিজেই তার অবসান করেছেন।

এই গ্রামটি আজও সুবর্ণবণিক প্রধান। লালবিহারীর অতি বৃদ্ধ প্র-প্রপিতামহ বৈষ্ণবচন্দ্র দে মণ্ডল এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পুত্র খেলারাম দে মণ্ডল। খেলারামের পুত্র লালবিহারীর প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডল বর্ধমান জেলায় বর্গীর হাঙ্গামার সময় (আনুমানিক ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) স্বগ্রাম পলাশী ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যান। এই গ্রাম বর্গীরা লুট করেছিল। প্রায় ষাট বৎসর পরে, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, গোকুলের পুত্র (লালবিহারীর পিতামহ) গোলোকচন্দ্র দে মণ্ডল পলাশী গ্রামে ফিরে আসেন। গোলোকের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ কমললোচন, মধ্যম রাধাকান্ত ও কনিষ্ঠ বেণীমাধব। মধ্যমপুত্র রাধাকান্তই লালবিহারীর পিতা। রাধাকান্তের জন্ম হয় ঢাকাতেই আনুমানিক ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ঢাকাতেই তাঁর প্রথম বিবাহ ও দুই পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদুটি মারা যায়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ যখন তিনি পিতার সঙ্গে বিপত্নীক অবস্থায় ঢাকা থেকে পলাশী গ্রামে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ২৩ বছর। পরে এই গ্রামেরই এক কন্যাকে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এই বিবাহের সন-তারিখ, কন্যার বা কন্যার পিতামাতার নাম, কিছুই জানা যায় না। কন্যার জন্ম হয় আনুমানিক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই কন্যাই লালবিহারীর মাতা। মাতার বয়স যখন আন্দাজ ১৬ ও পিতার বয়স ৪২ বৎসর তখন লালবিহারীর জন্ম হয় মাতুলালয়ে। লালবিহারীর আরেকটি ছোটভাই হয়েছিল। তাঁর নাম বনমালী। তিনি লালবিহারীর জীবদ্দশাতেই অল্প বয়সেই পত্নী ভগবতী দাসীকে রেখে মারা যান। বনমালীর জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারিখ জানা যায় না। লালবিহারীর ধর্মান্তর গ্রহণের পর প্রথমে বনমালী, পরে তাঁর স্ত্রী, পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

এখানে লালবিহারীর মায়ের কথাটা সেরে নেওয়া ভাল। তিনি লালবিহারীকে এত ভালবাসতেন যে, এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারতেন না। তাঁর বয়স যখন ২৬ বছর, তখন লালবিহারী গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় পড়তে যান। তিন বছর পরে ২৯ বছর বয়সে লালবিহারীজননী বিধবা হন। স্কুল ও কলেজে পড়বার সময়, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত, লালবিহারী লম্বা ছুটি পেলেই গ্রামে এসে মায়ের কাছে থাকতেন। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণের পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি যখন ১৮৪৩ সালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর মায়ের বয়স ৩৫ বৎসর। খ্রীষ্টান হবার ৬ বছর পরে ১৮৪৯ সালে লালবিহারী আবার একবার স্বগ্রামে আসেন। তখন তাঁর মায়ের বয়স ৪১ বৎসর। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ বলায় গৃহদ্বারে হারানো ছেলেকে দেখে মায়ের বুকফাটা কান্নার কথা লালবিহারী নিজেই লিখে গেছেন তাঁর অতুলনীয় ভাষায়। তারপর আর আমরা তাঁর মায়ের কোনোই খবর পাই না। তিনি কতদিন বেঁচে ছিলেন, কবে মারা যান, কিছুই জানার উপায় নেই। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। লালবিহারীর মুখ ছিল তাঁর মায়ের মতন।

তাঁর বাপ ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। প্রত্যহ সকালে স্নান, পূজা সেরে ও ১০৮ বার মালা জপ করে জল খেতেন, রাত্রে দু-তিন ঘণ্টা মালা জপ করতেন। "হরি হরি, রাধে গোবিন্দ" ইত্যাদি বুলি তাঁর মুখে লেগেই থাকত। জীবনে কখনো মাছ, মাংস ছোঁননি। একেবারে খাঁটি লোক ছিলেন—মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা জানতেন না। তাই ব্যাবসা করেও বৈষয়িক উন্নতি করতে পারেননি। তিনি কলকাতায় কোম্পানির কাগজের ও হুণ্ডির দালালি করতেন। ইংরেজী না জানলেও ব্যাবসার খাতিরে Discount, Interest, ইত্যাদি দু-চারটে ইংরেজী শব্দ বলতে পারতেন। কলকাতার বড়বাজারে রাজাকাটরায় একটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। প্রতিবছর পূজার সময় গ্রামে গিয়ে একমাস কাটাতেন। বাকী ১১ মাস কাটত কলকাতায়। নিজে ইংরেজী জানতেন না বলে ছেলেকে যেমন করেই হোক ইংরেজী শেখাতে হবে, এই ছিল তাঁর পণ। তাই ছেলেকে খ্রীষ্টান স্কুলে পড়াতেও কুণ্ঠিত হননি। ছেলের যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁকে গ্রামের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে কলকাতায় এনে পাদ্রি ডাফ্ সাহেবের স্কুলে ভর্তি করে দেন। তার কারণ, সে স্কুলে মাইনে লাগত না। আর ছেলের মাইনে দিয়ে পড়াবার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সে, তাঁর কলকাতায় মৃত্যু হয়। লালবিহারীর গায়ের রঙ কালো ছিল বলে তিনি তাকে আদর করে কালোগোপাল বলে ডাকতেন। বেশী বয়সের ছেলে বলে তাঁকে খুব ভাল বাসতেন। পৌত্তলিক পিতার সম্বন্ধে গোঁড়া খ্রীষ্টান লালবিহারী লিখেছেন যে, তাঁর পিতার মতো পিতা সংসারে হয় না।

গ্রামের শিবতলায় গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা বসত। ছ-বছর বয়সে হাতে-খড়ি দিয়ে লালবিহারীকে পিতা এই পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। সেখানে

দু'ই-পড়ুয়ার শ্রেণীতে এক বছর, তালপাতা-পড়ুয়ার শ্রেণীতে দুই-বছর, কলাপাতা-পড়ুয়ার শ্রেণীতে এক বছর—মোট চার বছর পড়ে যখন তিনি কাগজ-পড়ুয়ার শ্রেণীতে উঠলেন, তখন পিতা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ১৮৩৪ সালে জেনারেল এসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। স্কুল বিভাগে তখন মোট দশ বছর পড়তে হত। লালবিহারী দশ বছরের পাঠ সাত বছরে শেষ করে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সাত বছরের মধ্যে সকল পরীক্ষায় সর্ববিষয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, মাত্র একবছর ছাড়া। এই বছর তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় হন। এই বছর ক্লাসের কয়েকজন বুড়ো বুড়ো বখা ছেলের হাতে তাঁকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। এমন-কী রাস্তায় একা পেয়ে তারা তাঁকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিতেও ছাড়ত না। লারজিম মণ্ডল নামে এক বলবান সহপাঠীর সাহায্যে তিনি তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতেন। আর এই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো-তেরো বছর।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি চোরবাগানে তাঁর এক জ্ঞাতি (পিসতুতো) ভাইয়ের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে লাগলেন। সেখানে তিনি খ্রীষ্টান হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর থাকেন। এই বাসায় এক রাঁধুনি ছিল - তার নাম কুঙ্কর মা। সে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারতো না, পক্ষাঘাতে তার দুটো পা-ই পড়ে গিয়েছিল, আসনপিড়ি হয়ে দুহাতে ভর দিয়ে সে চলাফেরা করত। তার বয়স ছিল চল্লিশ, রঙ কালো, চেহারা কুৎসিত, চোখ ট্যারা, দাঁত প্রায় সবকটি পড়ে গিয়েছিল, তার উপর সে ছিল খোনা। সংসারে তার কেউ ছিল না। সে ছিল বালবিধবা, পুত্রহারা। কিন্তু এই বিকলাঙ্গ, কিম্ভূত-কিমাকার নারীটির সেবা ও সাহায্য না পেলে লালবিহারীর সে বাসায় থাকা ও পড়াশোনা করা আদৌ সম্ভব হত না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কুঙ্কর মা ভোরবেলায় উঠে স্নান করে লালবিহারীকে খাইয়ে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিত। আবার সন্ধের দিকেও সকাল-সকাল তাঁকে খাইয়ে দিত। লালবিহারী তারই ঘরের একপাশে শুয়ে ঘুমুতেন। সে রান্নার তেল থেকে একটু-একটু বাঁচিয়ে লালবিহারীর পড়ার জন্য সরিয়ে রেখে দিত। মাঝরাতে লালবিহারীকে ঘুম থেকে তুলে দিত। লালবিহারী ভোর পর্যন্ত সেই তেলের প্রদীপে পড়াশোনা করতেন। এ রকম করার কারণ এই যে, সন্ধ্যাবেলা থেকে তাঁর জ্ঞাতিভাইয়ের একটিমাত্র ঘরে তার বন্ধুবান্ধবরা এসে অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করত। সে সময়ে সেই ঘরে বসে লালবিহারীর পক্ষে পড়াশোনা করা

অসম্ভব ছিল। তাই সে সময়ে তিনি খেয়েদেয়ে কুঙ্কর মার ঘরে ঘুমুতেন। আর গভীর রাতে যখন আড্ডা ভেঙে বাড়ি নিস্তব্ধ হতো তখন তিনি উঠে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার মূলে ছিল কুঙ্কর মা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত কষ্ট স্বীকার করে ছেলেবেলায় পড়াশোনা করতে হয়েছিল সে কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু লালবিহারীকে যে সেই রকম বা তার চেয়েও বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল লেখা-পড়া শেখবার জন্য, সে কথা খুব কম লোকেই জানে। যতই দরিদ্র হোন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা অনেকদিন জীবিত ছিলেন। লালবিহারীর পিতাও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। সেই পিতাকেও হারালেন লালবিহারী মাত্র তেরো বছর বয়সে। তখন পৃথিবীতে তাঁকে সাহায্য করবার কেউই রইল না। হেয়ার সাহেবের স্কুল থেকে ভাল করে পাশ করতে পারলে হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে পড়া যায়, এই ভেবে তিনি গেলেন হেয়ার সাহেবের কাছে। কিন্তু হেয়ার সাহেব তাঁকে কিছুতেই তাঁর স্কুলে ভর্তি করলেন না। তাঁকে এই বলে বিদায় দিলেন যে, খ্রীষ্টান কলেজে পড়ে তাঁর মতিগতি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান ধরনের হয়ে গেছে। আর সে-রকম ছেলেকে ভর্তি করলে তাঁর স্কুলের ছেলেরাও খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। এই ঘটনাটি লালাবিহারীর নিজের ইংরেজী লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি :

"As I approached him (Mr. Hare) he called me to his side, took my hand, patted me on the chest, put his left arm round my neck and asked me what I wanted. Lal Behari—I want, Sir, to be admitted into your school. Hare—What school do you attend ?

Lal Behari—I am reading now in the General Assembly's Institution.

Hare—What books do you read ?

Lal Behari—I read Marshman's Brief Survey of History, Lennie's Grammer, Geography, Euclid Book II, New Testament and Bengali.

Hare—Why do you wish to leave the General Assembly's Institution ?

Lal Behari—People say there is better teaching in your School, besides I have a great desire to go to the Hindoo College from your school.

Hare—You should better remain where you are...

Lal Behari—No, Sir, kindly admit me into you school.

Hare—You read the New Testament, You are half a Christian, you will spoil my boys.

Lal Behari – I read the New Testament because it is a class book but I don't believe in it.

Hare—All Mr. Duff's pupils are half Christians. I won't take any of them into my school. I won't take you, you are half a Christian, you will spoil my boys.

'I begged hard", Mr. Day continues. "I earnestlly besought him to take me into his school, but he kept repeating the words "you are half a Christian. You will spoil my boys."

হাতে বই কেনার পয়সা নেই, অথচ একটা ইংরেজী অভিধান না কিনলেই নয়। কারণ তখনো নোটবুক বা মানের বই চালু হয়নি। অতি কষ্টে কয়েক আনা জমিয়ে তাই দিয়ে একখানি পুরাতন জনসন সাহেবের পকেট অভিধান কেনা হল, কিন্তু তার প্রথম অক্ষরের সব কটি পাতাই ছেঁড়া। এই অভিধানটি তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। কিন্তু শুধু অভিধান দিয়েই তো একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। তার জন্য ইংরেজী সাহিত্যের নামকরা লেখকদের বই পড়া দরকার। কিন্তু সে-সব বই কেনার পয়সা কোথায়? তখনকার দিনে নতুন বা পুরাতন বইয়ের এত দোকান ছিল না। চটের থলেতে যে যা পারে পুরোনো বই পুরে সেটা পিঠে ঝুলিয়ে মুসলমান ফিরিওয়ালারা কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বই ফিরি করে বেড়াত। এইরকম এক ফিরিওয়ালা ছিল "পাগলা চাচা"। কী যেন কেন, সে বালক লালবিহারীকে একটু স্নেহ করত। লালবিহারী একদিন কয়েক আনা দিয়ে একটি বই কিনলেন তার কাছ থেকে। কয়েকদিনের মধ্যে সেটিকে পড়ে শেষ করে পাগলা চাচাকে বললেন, "চাচা, আমার তো বইটি পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো গরিব মানুষ। প্রতিবার যে নগদ পয়সা দিয়ে তোমার কাছ থেকে নতুন-নতুন বই কিনব সে ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি এই বইটি ফেরত নিয়ে আরেকটি বই আমায় পড়তে দাও তো বড় ভাল হয়। আবার সেটি হয়ে গেলে আরেকখানি দিও।"

পাগলা চাচা কী ভেবে সে প্রস্তাবে রাজী হল। এইরকম করে লালবিহারী Addison-এর Spectator, Gibbon-এর Decline and Fall of the Roman Empire ও Hume-এর History of England পড়েন। বই

কিনতে পারতেন না বলে আর একটি রোগে তাঁকে ধরেছিল। আর এই রোগ তাঁর বহুদিন পর্যন্ত ছিল। রাস্তার উপর নজর রেখে তিনি চলতেন, আর কোনো ছাপানো কাগজ বা বইয়ের ছেঁড়া পাতা পড়ে থাকতে দেখলেই সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে আনতেন ও পড়ে সযত্নে গুছিয়ে রেখে দিতেন।

কিন্তু এই দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি কি স্কুলে কি কলেজে ক্লাসের সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করতেন। কোনো বিষয়েই কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। ১৮৪১ সালে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি দুটি প্রবন্ধ লিখে যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৩৫ টাকা পুরস্কার পান। পর বৎসর তৃতীয় শ্রেণীতে ম্যাকফারলেন স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলেজ বিভাগের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে চার-পাঁচ দিন ধরে লিখিত পরীক্ষা দিয়ে সব বিষয়ে যে-ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করতে পারত সে-ই এই পুরস্কার পেত। এখন এই ছাত্রকে বলা হত Dux of the Institution অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বা সর্দার-পড়ুয়া। ১৮৪২ সালে তাঁর কলেজের পাঠ সমাপ্ত হলেও তিনি স্বেচ্ছায় আরো দুই বৎসর (১৮৪৪-৪৫) কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং এই দুই বৎসরও ম্যাকফারলেন স্বর্ণপদক পান। মোট বারো বছর তিনি স্কুল-কলেজে পড়েছিলেন। তার মধ্যে এগারো বছর তিনি নিজ শ্রেণীর নেতা ও তিন বছর সমস্ত বিদ্যালয়ের নেতা হয়েছিলেন।

কলেজ ক্লাসে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের তখন উচ্চগণিত ও বিজ্ঞান পড়তে হত। গণিতের বিষয় ছিল—Mechanics, Hydrostatics, Pneumatics, Optics, Differential Calculus, Conic Sections, Spherical Trigonometry, Analytical Geometry। বিজ্ঞানের বিষয় ছিল—Physics, Chemistry, Astronomy, Geology, Principle of Steam Engine, Navigation। কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে সংস্কৃত পাঠ্য ছিল 'মুগ্ধবোধ' ও ফারসিতে 'গুলিস্তাঁ' ও 'বোস্তাঁ'।

লালবিহারী ইংরাজী ছাড়াও বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু, ফারসি, গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষা জানতেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন – এই কয় বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। অধ্যবসায় থাকলে চরম দারিদ্র্যও যে বিদ্যার্জনের পথে বাধা হতে পারে না তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লালবিহারী। এ বিষয়ে তাঁর জীবন দরিদ্র ছাত্র-মাত্রকেই চিরকাল উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮৪৩ সালের ২৩শে জুলাই লালবিহারী তাঁর শিক্ষক টমাস স্মিথের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এর ফলে জ্ঞাতি ভাইয়ের বাসা ছেড়ে কলেজ-সংলগ্ন কন্‌ভার্টস হোমে এসে তাঁকে বাস করতে হয়। সেকালে নিজ ধর্ম ত্যাগ করা একটা যে-সে ব্যাপার ছিল না। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি, সমাজ, সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা যুদ্ধ ঘোষণার সমান ছিল। সুতরাং স্বধর্ম-ত্যাগীর প্রতি কারো ক্ষমা ছিল না। নিকটতম আত্মীয় পর্যন্ত তাকে শুধু ত্যাগই করত না, তার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারও করত। প্রকৃত বীর বা বিদ্রোহী ছাড়া অন্যের পক্ষে এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। লালবিহারী খাঁটি বিদ্রোহী ও বীর ছিলেন। তৎকালীন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাই পাশ্চাত্ত্যের উন্নততর সমাজের ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে বড় রকমের মূল্য দিতে হয়েছিল। এমন কী, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। সে যুগের এমন আরো কয়েকটি বীর ও বিদ্রোহী বাঙালী সন্তান হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন। যেমন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়)। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন ও বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীমাত্রেরই নমস্য হয়ে আছেন।

১৮৪৬ সালে লালবিহারী ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের catechist নিযুক্ত হন। পাঁচ বছর পরে ১৮৫১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ধর্মপ্রচার করবার অনুমতি পান। কালনা মিশনের অধীনে তাঁকে কাজ করতে পাঠানো হয়। কালনা থেকে তিনি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতেন। এই সময়ে প্রত্যেক দিনের বিবরণ তিনি রোজনামচার মতো লিখে রাখতেন। এই বিবরণীগুলিকে বলা হয় তাঁর Journals of Preaching Tours। এই 'ভ্রাম্যমাণের ডাইরি'তে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক পল্লীবাংলার অবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। এই সময়ে তিনি কোনো এক গ্রামে জীবন্ত গোবিন্দ সামন্তের সাক্ষাৎ পান। এই বিবরণীগুলি ছাপানো হয়েছিল কিনা তার হদিশ পাওয়া যায় না। ৪ বৎসর পরে ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি Minister বা আচার্য হন। এই খ্রীষ্টমণ্ডলীতে তিনিই প্রথম বাঙালী আচার্য। কিন্তু আচার্য হয়ে দেখলেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রেও বর্ণভেদ আছে। মিশন পরিষদে শ্বেতাঙ্গ আচার্যদের স্থান আছে, কৃষ্ণাঙ্গদের নেই। এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর গুরু ডাক্তার ডাফ্—যাঁকে

তিনি পিতার মতো ভক্তি করতেন—তাঁর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বাদানুবাদ ও মনোমালিন্য হয়। অবশেষে তিনি পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। ডাক্তার ডাফ্ তাঁকে অন্তত এক বছরের জন্য কালনা মিশনের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট-এর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন ও প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর কাজে উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এই শর্তে তিনি কালনায় যান। কিন্তু যখন দেখলেন যে, সত্যই তাঁর কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না তখন তিনি পদত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করে চার বছর কালনায় থেকে যান। এই ব্যাপারে তিনি যে কতখানি স্বাধীনচেতা ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। চার বছর কালনার কাজ করার পর তাঁকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ডাফ্ গীর্জার আচার্য করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এইখানে তিনি ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত আচার্যের কাজ করেন।

১৮৬০ সালের দোসরা জানুয়ারি তিনি স্থলপথে বোম্বাই প্রদেশের সুরাট শহরে গিয়ে রেভারেণ্ড হরমুসজী পেসটনজী নামে এক খ্রীষ্টান পার্শী ভদ্রলোকের বাইশ বছরের কন্যা কুমারী বাচুবাইকে বিবাহ করেন। বোম্বাই থেকে জলপথে সস্ত্রীক কলকাতায় ফিরে তিনি গীর্জা-সংলগ্ন আচার্যের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। এই বাড়ির জন্য কোনো ভাড়া লাগত না বটে কিন্তু বাড়িটি বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল। এখানে তাঁর পর-পর তিন কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। তার মধ্যে দ্বিতীয় কন্যাটি ১৮৬৪ সালে, তৃতীয় কন্যাটি ১৮৬৬ সালে ও পুত্রটি ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে মারা যায়। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার ফি ও আচার্যের বেতন দুই মিলিয়ে তাঁর মোট আয় ছিল মাত্র দেড়শত টাকা। এই অল্প আয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের ব্যয় সংকুলান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তিনি সেই জন্য ডাফ্ সাহেবের কাছে তাঁর কলেজে একশো টাকা বেতনের একটি আংশিক অধ্যাপকের চাকরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সাহেব আচার্যদের এইরূপ অধ্যাপকের কাজ দেওয়ার নজির থাকা সত্ত্বেও ডাফ্ সাহেব লালবিহারীকে ঐরূপ সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন।

লালবিহারী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেই জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে, এই কাজ তাঁকে কোনোদিন ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পর-পর তিনটি সন্তানের মৃত্যু, তার উপর অর্থকষ্ট, এই দুই কারণ মিলে তাঁকে পৌরোহিত্যের কাজ থেকে বিদায় নেবার কথা চিন্তা করতে বাধ্য করল। এমন

সময় ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলার ছোটলাট স্যার এশলী ইডেন-এর আদেশে তিনি বহরমপুর সরকারী কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

এখন থেকে তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল - শিক্ষাব্রতীর অধ্যায়। কিন্তু এই জীবনেও তিনি নিজের নামের পূর্বে রেভারেণ্ড বা আচার্য পদবী লিখতে ছাড়েননি, যদিও তাতে তাঁর ক্ষতি বই লাভ ছিল না। চার বৎসর বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনার পর ১৮৭২ সালে হুগলী কলেজে বদলি হন। এখানে তিনি আঠারো বৎসর ইংরেজী সাহিত্যের ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। ১৮৮৯ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ১০০০ টাকা। শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার জন্য তিনি বহু প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষমহল তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হননি।

অবসর গ্রহণের পর তিনি কলকাতায় এসে অবশিষ্ট জীবন ২নং বেনেপুকুর লেনের বাড়িতে বাস করেন। কিন্তু শেষের দিনগুলি তাঁর শান্তিতে কাটেনি। ১৮৭২ সাল থেকে বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামে তিনি একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছিলেন। এই পত্রিকাটির পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই কারণে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর বড় ছেলে লালবিহারী দে'কে (তাঁর নামেই পুত্রের নাম) বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়। পরে জানা যায় যে, সে রোমান ক্যাথলিকদের পাল্লায় পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এই কারণেও তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তা কম ছিল না। তার উপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে শেষে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অবশেষে তাঁর অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় বহুদিন শয্যাশায়ী থেকে তিনি ১৮৯৪ সালের ২৮শে অক্টোবর প্রায় সত্তর বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের কড়েয়া রোড সমাধিক্ষেত্রে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। সেখানে, তাঁর, তাঁর স্ত্রীর ও পুত্রকন্যাগণের সমাধি আজও বর্তমান।

লালবিহারী দে দেশের ও সমাজের সেবা করে গেছেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। এই ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তাঁর মতো ইংরেজী, ভারতবাসী কেন, অনেক ইংরেজও লিখতে পারতেন না। রো নামে বিখ্যাত

ইংরেজ অধ্যাপক নিজের বইয়ে বাঙালীদের লেখা ইংরেজীকে "বাবু ইংরেজী" বলে ঠাট্টা করেছিলেন। লালবিহারী স্বজাতির এই অপমান নীরবে সহ্য করতে পারেননি। তিনি এক প্রবন্ধ লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন ও রো সাহেবের নিজের লেখা থেকে ভূরি ভূরি ইংরেজী ভুল বার করে দেখিয়ে দেন। এই মুখের মতো জবাবে শুধু বাঙালীরই নয়, সমস্ত ভারতবাসীর মাথা উঁচু ও গর্বিত ইংরেজের মাথা হেঁট হয়েছিল। এই ঘটনায় সেই সময়ে বাংলাদেশে লালবিহারীর নামে ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। বাংলাদেশের একজন অখ্যাত দরিদ্র পল্লীবালক কেমন করে ইংরেজীর মতো এক কঠিন বিদেশী ভাষার উপর এমন অতুলনীয় অধিকার লাভ করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। একজন বাঙালীর লেখা ইংরেজী বই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ইংরেজী গদ্য রচনার আদর্শ হিসাবে ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হবে এটা সামান্য গৌরবের কথা নয়। এ গৌরব ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র লালবিহারীই অর্জন করেছেন।

তিনি শুধু ধর্মযাজক ও অধ্যাপক ছিলেন না, সাংবাদিকও ছিলেন। কলিকাতা রিভিউ, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি সে সময়ের প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রে তিনি সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। বেথুনসভা, বঙ্গীয় সমাজ, বিজ্ঞান সভা ইত্যাদি বহু সভার তিনি সদস্য ছিলেন ও সেইসব সভার অধিবেশনে ইংরেজী ভাষায় বহু প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সেগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ও স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি নিজেও চারখানি সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। প্রথমটি তাঁর একমাত্র বাংলা ভাষায় সম্পাদিত মাসিক, নাম 'অরুণোদয়'। এই পত্রিকা ১৮৮৫-৮৬ সালে কলিকাতা ও কালনা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান রিফরমার পত্র সম্পাদনা করেন অল্প দিনের জন্য। ১৮৬৬ সালে সাপ্তাহিক ফ্রাইডে রিভিউ সম্পাদনা করেন, এটাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর সর্বশেষ পত্রিকা মাসিক বেঙ্গল ম্যাগাজিন ১৮৭২ সালের আগস্ট মাসে হুগলী কলেজে এসে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা বহু বছর চলেছিল। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনাগুলি হুগলী কলেজে অধ্যাপনাকালে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

লালবিহারীর রচিত প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া গেল। সবগুলি প্রবন্ধই ইংরেজীতে লেখা।

কলিকাতা রিভিউ পত্রিকাতে প্রকাশিত

১। চৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় (জানুয়ারি ১৮৫১)

২। বাঙালীর খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ (জুন ১৮৫১)
৩। বাংলার পাল-পার্বন (জুলাই ১৮৫২)
বেথুন সভায় পঠিত
৪। বাংলাদেশে বাংলা শিক্ষা
৫। বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা
৬। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা (ডিসেম্বর ১৮৬৮)
৭। বাংলাদেশের কলেজে ইংরেজী শিক্ষা (মার্চ ১৮৭৪)
৮। পার্শীদের সম্বন্ধে (মার্চ ১৮৭৫)
৯। রেভারেণ্ড ডাক্তার জন উইলসন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)
বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত
১০। স্বর্গীয় বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র
১১। আমার ছাত্র-জীবনের স্মৃতি
১২। বাংলাদেশের সুবর্ণবণিক জাতি
১৩। ডাক্তার কেরীর জীবন ও সাধনা

এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন :

১। "গোবিন্দ সামন্ত বা বাঙালী কৃষকের জীবন"। এটি একটি উপন্যাস। ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে পুস্তকখানির রচনা সম্পূর্ণ হয়। শেষে আরও তিন অধ্যায় জুড়ে দিয়ে ১৮৭৪ সালের মাঝামাঝি "বাঙালী কৃষকের জীবন" এই নামে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস লিখে লালবিহারী উত্তরপাড়ার জমিদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষিত ৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

২। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ স্মৃতি

লালবিহারীর শিক্ষা-ও ধর্ম গুরু ডাফ্ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৮৭৮ সালে বই-খানি লেখা ও ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি লালবিহারীর আত্মজীবনী।

৩। বাংলাদেশের রূপকথা

১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। যে-সব গল্প শুনিয়ে এক সময়ে বাংলার ঠাকুরমা-দিদিমারা তাঁদের ছোট নাতি-নাতনীদের ভোলাতেন সেই সব গল্পের সংগ্রহ। এই গ্রন্থখানি লালবিহারীর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। গণ-মানসের গভীরে যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অব্যক্ত থাকে সেইগুলি অভিব্যক্ত হয় রূপকথার আকারে। বাংলাদেশের রূপকথা

সংগ্রহ করে লালবিহারী বাঙালী গণ-মানসের সঙ্গে বাঙালী জাতির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই হিসাবে তিনিই বোধহয় এ যুগে বাংলাদেশের আদি লোক-সাহিত্যিক।

কালনা মিশনের সর্বাধ্যক্ষ থাকা কালে তিনি শ্বেতাঙ্গ পাদ্রী সাহেবদের এদেশীয়দের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পরে সেই বক্তৃতাগুলি ছাপিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন 'Searchings of Heart' এই বক্তৃতামালায়। তাঁর পূর্বে কোনো দেশী পাদ্রী বিলাতী পাদ্রীদের এমন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে সাহসী হননি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পার্শী মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহের পরোক্ষ কারণ এই বইখানি। এই বইখানি পড়েই তাঁর ভাবী স্ত্রী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

আর একটি কথা না বলে লালবিহারী প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। সেটি হচ্ছে তাঁর স্বদেশ- ও স্বজাতি-প্রীতি। বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অগাধ। তাঁর তেরটি প্রবন্ধের মধ্যে নয়টি ও তিনটি গ্রন্থের মধ্যে দুটি বাংলা ও বাঙালীকে নিয়ে লেখা। তাই বাঙালীমাত্রেরই কর্তব্য তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা। কিন্তু বাংলা-মায়ের সন্তানদের মধ্যে যারা তাঁর সমস্ত হৃদয় ও চিন্তা অধিকার করে ছিল তারা হচ্ছে বাংলার পল্লীবাসী সরল, অনাড়ম্বর, দরিদ্র, নির্যাতিত কৃষক সমাজ। পল্লীসমাজ থেকে দূরে নির্বাসিত হয়েও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও এই সব 'মূক মূঢ়'-দের কথা ভোলেননি, এরা ছিল তাঁর পরম আত্মীয়। তাঁর যে কী গভীর মমতা ও সমবেদনা ছিল এই অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত লোকগুলির প্রতি তার জলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে 'গোবিন্দ সামন্তর' পাতায় পাতায়।

'নীলদর্পণ' যদি হয় বাঙালী কৃষকের মহানাটক, 'গোবিন্দ সামন্ত' নিশ্চয়ই তাদের মহাকাব্য। বাংলার পল্লীসমাজের ও কৃষক জীবনের এমন সর্বাঙ্গীণ নিখুঁত ছবি তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো ভাষাতেই কেউ আঁকতে পারেননি। এ ছবি এক-রঙা নয়, দো-রঙা। চাষীর জীবনে একদিকে যেমন আছে সুখ, আহ্লাদ, তেমনি অন্যদিকে আছে কষ্ট, অশান্তি; যেমন খেলা-ধূলা, নবান্ন, পৌষপার্বণ, তেমনি দেশী জমিদার ও বিদেশী কুঠিয়ালের শোষণ ও অকথ্য অত্যাচার। এ অবস্থায় কৃষকের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম অনিবার্য। এই সংগ্রামকে তিনি কোথাও চাপবার বা এড়াবার চেষ্টা করেননি। শিল্পী হিসাবে নিরপেক্ষতার ভান তাঁর মধ্যে নেই। নির্যাতিতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। চাষীদের অপমানে নিজে

অপমানিত বোধ করেন, তাদের উপর অত্যাচার হলে নিজের উপর অত্যাচার হচ্ছে মনে করে রাগে জ্বলে ওঠেন। তাদের হাজার দুর্বলতা তিনি ক্ষমা করতে পারেন, পারেন না শুধু একটি—কাপুরুষতা। যখনই তাদের মধ্যে বীরত্ব দেখেছেন আনন্দে ও গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছে। তাইতো বর্ধমান জেলার এক উগ্রক্ষত্রিয় চাষী-পরিবারকে তাঁর গল্পের নায়ক করেছেন। কারণ তাঁর মতে সমস্ত বর্ধমান জেলায় উগ্রক্ষত্রিয়দের মতো এমন স্বাধীনচেতা, সাহসী বীর কৃষক সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় নেই। গোবিন্দ সামন্ত গ্রন্থটি পড়ে ১৮৮১ সালে জগৎ-বিখ্যাত জীব-বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন অযাচিতভাবে লালবিহারীর পুস্তক প্রকাশককে লিখেছিলেন, "গ্রন্থকারকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন যে, 'গোবিন্দ সামন্ত' পড়ে আমি যেমন শিক্ষা, তেমনি আনন্দ লাভ করেছি"।

দুঃখের বিষয় বিদেশী ভাষায় লেখা বলে এই কাহিনী যাদের নিয়ে লেখা তাদের কাছে আজ পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। সম্প্রতি এই বইখানির একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বইখানির তর্জমা বর্তমানে একটিও নেই। বাংলার কৃষকেরা যখন এই উপন্যাসের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হবে তখন নিজেদের জীবনের বাস্তব চিত্র দেখে একদিকে যেমন তারা খুশী হবে অন্যদিকে তাদেরই পূর্ব পুরুষেরা একদিন এই দেশের মাটিতেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা জেনে প্রেরণা পাবে। তখন তারা লালবিহারীকে তাদের পরম বন্ধু বলে মানবে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল তাঁর নাম স্মরণ করবে। 'গোবিন্দ সামন্তর' লেখককে আমরা ভুলতে পারি—তারা ভুলবে না কখনও।

পরিশিষ্ট

লালবিহারীর বংশধরদের বিষয় জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাঁদের সম্বন্ধে যা জানা যায় সংক্ষেপে লেখা হল।

লালবিহারীর সর্বসমেত দশটি সন্তান হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। দুটি কন্যা ও একটি পুত্র শৈশবেই মারা যায়। বাকী তিনটি কন্যা বহুদিন বেঁচে ছিলেন। অবশিষ্ট চার পুত্র যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মারা যান। কিন্তু তাঁদের জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ পাওয়া যায় নি। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বড় ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যান ও ইউরোপে মারা যান। তিনি বিবাহ না

করায় তাঁর ধারা লুপ্ত। বাকী তিন ছেলে বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র আবগারির ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, তিনি ডুমকায় মারা যান। তাঁর ইংরেজ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তাঁরা বিলাতে থাকেন। তৃতীয় পুত্র পাটের ব্যাবসা করতেন। তিনি ইংলণ্ডে মারা যান। তাঁর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা আছেন, এঁরাও বিলাতে থাকেন। চতুর্থ পুত্র এখানে রেলে চাকরি করতেন, পরে বিলাতে মারা যান। তাঁর স্ত্রী রুমেনীয়, তাঁর সন্তানাদি হয়নি। কন্যাদের মধ্যে মাত্র সর্বজ্যেষ্ঠ কন্যা বিবাহ করেন, বাকী দুটি কন্যা অবিবাহিত থাকেন। এখন কোনো কন্যাই জীবিত নেই। বড় মেয়ের বিবাহ হয় কলকাতা হাইকোর্টের উকিল মণিলাল সাণ্ডেলের সঙ্গে। তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা হয়। তৃতীয় সন্তান কন্যা, বাকী সব পুত্র। প্রথম পুত্র, চতুর্থ পুত্র ও কন্যাটি জীবিত নেই। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়টি অসুস্থ ও তৃতীয়টি সুস্থ। লালবিহারীর একমাত্র দৌহিত্র যিনি এখনও সুস্থ ও ভালভাবে বেঁচে আছেন তাঁর নাম এন. এল. (নরম্যান লিওনার্ড) সাণ্ডেল। তিনি মার্টিন কোম্পানিতে ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করতেন। মাতৃভাষা ইংরেজী হলেও বাংলা ভাষায় সুন্দর কথাবার্তা কইতে পারেন। লালবিহারীর বংশধরদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। তিনি অবিবাহিত, বয়স সত্তর বছর। লালবিহারীর বংশধরদের অনেকেরই ফটো তাঁর কাছে আছে। তিনি কলকাতায় ২৯ নং ইলিয়ট রোডের বাড়িতে ১৯৫৩ সালের ৬ই আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন।

লালবিহারীর পার্শী স্ত্রী শ্রীমতী বাচুবাই দে ১৮৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২৪ সালের ১লা ডিসেম্বর ৮৬ বৎসর ৭ মাস বয়সে ২৯নং ইলিয়ট রোডের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। ইনি মৃত্যুর পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী মেয়েদের জন্য লিখে রেখে যান। তাঁর মৃত্যুর পর এটি তাঁর মেয়েরা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি চতুর্থ ও পঞ্চম কন্যা নিয়ে কিছুকাল ২নং বেনেপুকুর লেনের বাসায় থাকেন। পরে ২৯ নং ইলিয়ট রোডের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন।

শীল উপাধিধারী একজন সুবর্ণবণিক এই বাড়ির মালিক ছিলেন। এই ভদ্রলোকটি মারা যাবার পর অনুমান ১৯০৪-৫ সালে প্রায় ১৮০০০ টাকায় বাচুবাই তাঁর পুত্রের কাছ থেকে এই বাড়ি খরিদ করেন। এই বাড়িতেই তিনি ও তাঁর দুই কন্যা—কুমারী অ্যালিস (Alice) ও কুমারী হেলেন মারা যান। কুমারী অ্যালিস Official Trustee ও Administrator General-কে তাঁর

সম্পত্তির একসিকিউটার করে যান। এই বাড়িটি এতদিন Administrator General-এরই তত্ত্বাবধানে ছিল। শ্রীযুক্ত এন. এল সাণ্ডেল তাঁরই অনুমতি-ক্রমে এই বাড়িতে একা বাস করতেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকে Administrator General বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছেন। বিক্রির টাকা থেকে লালবিহারীর তিন পৌত্র, দুই পৌত্রী ও তিন দৌহিত্র মোট এই আট জন জীবিত উত্তরাধিকারী সমান অংশে ভাগ পাবেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লালবিহারীর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মণিলাল সাণ্ডেল এম. এ. বি এল-এর সঙ্গে। মণিলালের জন্ম ১৮৪৪ সালের ১২ই মার্চ, মৃত্যু ১৮৯৭ সালের ৯ই জানুয়ারি। কলকাতার রিপন স্ট্রীটের উত্তরে সাণ্ডেল স্ট্রীট এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। রিপন স্ট্রীট ও সাণ্ডেল স্ট্রীটের মাঝখানে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল। সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। মণিলালের পিতা ছিলেন রেভারেণ্ড হরিহর সাণ্ডেল (জন্ম ১৮২০—মৃত্যু ১৮৮৭) ও মাতা রাইমণি সাণ্ডেল (জন্ম ১৮২১—মৃত্যু ১৮৯৩)। ইনি সাঁতরাগাছির লাহিড়ী বংশের মেয়ে। এঁরা সবাই ছিলেন চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কলকাতার লোয়ার সারকুলার রোড প্রোটেস্ট্যাণ্ট সমাধিক্ষেত্রে এঁদের তিন জনেরই সমাধি বিদ্যমান। স্বামীর মৃত্যুর পর লালবিহারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, মাতা ও ভগিনীদের সঙ্গে ২৯নং ইলিয়ট রোডের বাড়িতে কোনোদিন থাকেননি। তিনি বিডন স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া করে স্বতন্ত্রভাবে বাস করতেন। এই বাড়িতেই তিনি মারা যান।

লালবিহারী দের পূর্বপুরুষগণ

১। বৈষ্ণবচন্দ্র মণ্ডল
(বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী গ্রামে বাস)

↓

২। খেলারাম দে মণ্ডল
(ঐ গ্রামে বাস)

↓

৩। গোকুলচন্দ্র দে মণ্ডল
(বর্গীর হাঙ্গামার সময় অনুমানিক ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যান)

↓

৪। গোলোকচন্দ্র দে মণ্ডল
(১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে সোনাপলাশী গ্রামে ফিরে আসেন)

↓

৫। কমললোচন — রাধাকান্ত — বেণীমাধব

[জন্ম ঢাকায় আনুমানিক ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সঙ্গে সোনাপলাশী গ্রামে ফিরে আসেন। দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ করেন ঢাকায়। সেই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। স্ত্রী ও পুত্র দুটি ঢাকায় মারা যায়। দ্বিতীয় বিবাহ করেন স্বগ্রামে। এই স্ত্রীর জন্ম আনুমানিক ১৮০৮]

↓

লালবিহারী দে
[ইনি মণ্ডল উপাধি ত্যাগ করেছিলেন]
জন্ম মাতুলালয়ে ১৮।১২।১৮২৪ তারিখে
মৃত্যু ২৮।১০।১৮৯৪ তারিখে কলকাতায়।

বনমালী দে মণ্ডল
[লালবিহারীর জীবদ্দশাতেই ইনি মারা যান]
=ভগবতী দাসী।

লালবিহারী দের বংশধরগণ

লালবিহারী দে
[১৮।১২।১৮২৪ — ২৮।১০।১৮৯৪]
বাচুবাই দে
[২৮।২।১৮৩৮—১।১২।১৯২৪]

১	২	৩	৪	৫
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
(নাম অজ্ঞাত) ৮।১২।১৮৬৬—৬।৭।১৮৬৭	লালবিহারী দে (জুনিয়র) (রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হয়ে যান।)	সোরাবজী সাপুরজী দে (আবগারি বিভাগের ডেপুটি কালেক্টার। মৃত্যু ডুমকায়) =ইংরেজ স্ত্রী	হরমুশজী টেগোর দে (পাট ব্যবসায়ী,ইংল্যাণ্ডে মৃত্যু) =অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রী	রুস্তমজী আরদেশির দে (এ দেশের রেলে চাকরি করতেন। ইংল্যাণ্ডে মৃত্যু।) =রুমেনীয় স্ত্রী

সোরাবজী সাপুরজী দের সন্তান:

পুত্র	কন্যা
এডওয়ার্ড অসলার দে (ইংল্যাণ্ডে দাঁতের ডাক্তার)	কুমারী উইনিফ্রেড দে এম. এ, বি.টি.—গ্লাসগো (এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা)

হরমুশজী টেগোর দের সন্তান:

পুত্র	পুত্র	কন্যা
হেনরি হারভি দে (ইংল্যাণ্ডে সাংবাদিক)	টমাস হারভি দে (কলকাতা পোর্টকমিশনারের অধীনে চাকরি করতেন। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের স্কুলশিক্ষক)	মিসেস ডানকান (ইংল্যাণ্ডে থাকেন)

লালবিহারী দে (কন্যাগণ)

=বাচুবাই দে

৬	৭	৮	৯	১০
কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
মিসেস মেরী ম্যাকে সাণ্ডেল (১৮৬০ — ৩০।৯।১৯৪৪) = মণিলাল সাণ্ডেল এম.এ, বি.এল, (১২।৩।১৮৪৪—৯।১।১৮৯০, কলকাতা হাইকোর্টের উকিল)	অ্যালিস হরমুশজী দে (১২।১১।১৮৬১— ১।২।১৮৬৪)	মারিয়া মিচেল দে (১৭।৫।১৮৬৫— ২০।৩।১৮৬৬)	কুমারী অ্যালিস বাচুবাই দে (১৮।১১।১৮৭৩— নভেম্বর ১৯৫০)	কুমারী হেলেন পরেশমান রতনবাই দে (২৩।১১।১৮৭৬ - ২৮।৬।১৯৩৬

মিসেস মেরী ম্যাকে সাণ্ডেলের সন্তান:

১	২	৩	৪	৫	৬
পুত্র	পুত্র	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র
আর. এল এ. সাণ্ডেল (মৃত)	নর্মান লিওনার্ড সাণ্ডেল (মার্টিন কোম্পানির ইনজিনিয়র, অবিবাহিত। জীবিত, বয়স সত্তর)	কুমারী জেসিকা অগাস্টা সাণ্ডেল (মৃত)	হ্যারল্ড লায়োনেল সাণ্ডেল (জীবিত, বয়স ৬৪ বছর)	জেমস লিউইস সাণ্ডেল (মৃত)	টমাস জর্জ সাণ্ডেল জীবিত। বয়স ষাট বছর।

কবিতাগুচ্ছ

রফিক আজাদের কবিতা

তারাপদ রায়

'আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বেছে নিই
এই কষ্টকর কবির জীবন।' রফিক আজাদ

* *

রফিক আজাদের 'নির্বাচিত কবিতা' ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে তাঁর আরো দুইটি কবিতায় বই ছিলো, 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে' এবং 'অসম্ভবের পায়ে'। ঐ সময়েই রফিক আজাদের আরেকটি কবিতায় বই 'আমার প্রধান প্রবণতা' প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু প্রকাশিত হয় নি, এখনো পর্যন্ত হয়েছে কিনা জানি না, তবে সেই সময়টা ছিলো ১৯৭৫-এর আগস্ট মাস, শেখ মুজিব নিহত হলেন, অনেক কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো। এর পরে এই বছরখানেক আগে রফিকের নতুন কবিতার বই 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' প্রকাশিত হয়েছে।

বেশ দূরের এবং ভিন্ন দেশের অন্য এক রাজধানীর এক তরুণ কবি সম্পর্কে এত কথা আমার জানার কথা নয়। ঢাকার কবিদের মধ্যে শামসুর রহমান ও আল মাহমুদ এবং শহীদ কাদরি আমাদের খুব কাছের লোক। তাঁদের চাল-চলন আমাদের চেনা, তাঁদের ভাষা আমরা বুঝি, তাঁদের রচনা হাতে এলে আমরা যত্ন ও সম্ভ্রম সহকারে স্বনজরে দেখি। ওখানে এখন আমাদের বেলাল চৌধুরীও আছেন, এবং রফিক আজাদকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সমীহ করতে শুরু করেছি। তার কারণ, নিশ্চয়ই তাঁর কবিত্ব ও প্রতিভা, কিন্তু আমাকে অনেক বেশি অভিভূত করেছে তাঁর সহ্যশক্তি।

রফিক আজাদকে আমি তাঁর শিশুকাল থেকে চিনি। সৌভাগ্যক্রমে ধলেশ্বরী অববাহিকায় যে স্বপ্নসম মফঃস্বল শহরে আমার জন্ম ও শৈশব, সেখানেই আমার কয়েক বছর পরে তাঁর আবির্ভাব। আমি এবং রফিক আজাদ এবং ঐ টাঙ্গাইলের জল ও মৃত্তিকা সঞ্জাত আরো সহস্রাধিক কবি বনগাঁ-বার্নপুর হিলি সীমান্ত-রেখায় দুই তীরে রয়েছেন। টাঙ্গাইলের কবি সম্পর্কে এই হিসাব অবশ্যই আনুমানিক, কিন্তু একটা কথা বিনা অনুমানে, বিনা দ্বিধায় বলা যায়- রফিক আজাদই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক। তাঁর অনুপম সারল্য এবং সংস্কারহীন চেতনা তাঁর কবিতাকে উজ্জ্বল করেছে, স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে। রফিক আজাদ লিখেছেন,

'আমার কবিতাগুলি ১৯৭৩ থেকে
সম্রাজ্ঞীর গুপ্তচর সম খুঁজতে বেরিয়েছে শুধু
আমার কাঙ্ক্ষিত সেই দীর্ঘ দুটি চোখ।'...

'তোমার চোখের সামনে আমার কবিতাগ্রন্থ
অস্পষ্ট মধুর মফঃস্বলে বসে তুমি
কবির বোকামি দেখে হাসছো নতমুখে।'...

রফিকের সহ্যশক্তির কথা বলছিলাম। এইতো সেদিন দিল্লী থেকে কলকাতা হয়ে বাড়ি ফেরার সময় আমাদের কলকাতার বাড়িতে রফিকের মাথায় আড়াই মণি বইয়ের তাক ভেঙে পড়লো, তাতে রফিক আজাদের নির্বাচিত কবিতা বইটিও ছিলো, রফিকের হাত ভেঙে গেলো। সে হাত নাকি এখনো ভালো করে জোড়া লাগেনি। কিন্তু সেই অতিবড় দুর্ঘটনার মুহূর্তেও রফিকের মুখে হাসি লেগে ছিলো। এবং এই প্রথম নয়, কতবার যে রফিকের হাত-পা ভেঙেছে, মোটর সাইকেল থেকে পনেরো গজ ছিটকিয়ে রাস্তায় অপর পারে গিয়ে পড়েছে, জিপ উলটিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই—রফিক আজাদ চিরন্তন সৈনিক; মুক্তি যোদ্ধা, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় সত্যি সত্যি তিনি কাঁধে বন্দুক নিয়ে লড়েছেন। নজরুল ইসলামের পর রফিকই আমাদের একমাত্র সৈনিক কবি।

কিন্তু রফিকের কবিতায় কোথাও যুদ্ধের রক্তের দাগ কিংবা গুলির বারুদের গন্ধ লেগে নেই। তাঁর কবিতা বহতা নদীর জলের মতো অমল ও নিষ্পাপ।

তোমাকে পড়েই শিখে নিই
শব্দের সঠিক অর্থ, মূল ধাতু, নির্ভুল বানান।

তোমাকে দেখেই জেনে নিই কোন্ ঠিকানায় আছে
সুন্দরের ঘরদোর…
…তোমার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মুহূর্তেই লেখা হয়
কবিতায় ব্যবহার্য সমস্ত ছন্দের মূলসূত্র।…

রফিক আজাদের পাঁচটি কবিতা

পুনরাবির্ভূত

আমার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ব্যবধানে ফিরে এসে
বেশ যত্নসহকারে দেখি মানুষের মুখগুলি,
দেখে যেতে থাকি, খুব কাছে থেকে দেখাই নিয়ম।
মুখচ্ছদ ব্যবহার না ক'রেও অনেকের মুখ,
মুখের মণ্ডল ঢাকা প'ড়ে গেছে ভয়াবহভাবে,
ধুলো জ'মে গেছে মুখে—যেন বহুদিন পড়ে আছে
একভাবে, ব্যবহারহীন কোনো গ্রন্থের মতন
কোনো ব্যগ্র আঙুলের ছাপ যেন পড়েনি কখনো
অসংখ্য চোখের ভিড়ে সেই চোখ এখনো পাইনি
খুঁজে আমি—, যে চোখে দেখতে পাবো পবিত্র আগুন।

আমার মৃত্যুর পর দীর্ঘ ব্যবধানে ফিরে এসে
স্বভাবত দেখতে চেয়েছি উদ্যত ছুরির ফলা,
চতুর্দিকে দেখা যাবে—এমনই তো আশা ছিল।
পরিবর্তে মানুষের ন্যুব্জপীঠ দেখে দেখে ক্লান্ত,
হতাশ হয়েছি। প্রতিবাদহীন ফাঁপা মানুষের
নিঃশব্দ মিছিল দেখে যেতে থাকি বিরামবিহীন।
বিপরীত মানুষেরা দ্রুত দর্পভরে চলে যায়,
তাদের হাতের চাবুকগুলিও খুব সুচতুর।
সংবেদনার তীর্থে বিপরীত দর্পী পদাঘাতে

গড়ায় অশ্রুর ধারা। কঠিন চোয়াল এই সব
মানুষেরা ক্রমে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ সমাজ এক
গ'ড়ে তোলে : পদাঘাতে-পদাঘাতে ভেঙে ফেলে ন্যায়
মানব-মন্দির। মানুষ গিয়েছে ভুলে আজকাল
মানবের যোগ্য আচরণ : মানুষের কষ্ট হ'লে
মানুষেরই কষ্ট হবে খুব—এটাই তো স্বাভাবিক
ছিলো।

শরীরে ও মনে দ্রুত ঘৃণা বাড়ে, সারারাত
ধ'রে বাড়ে ব্যথা ও বেদনা। বাড়াবাড়ি রকমের
উল্টোপাল্টা বায়ু বয়ে যেতে থাকে মনের গভীরে,
দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসে গালে চড় খেয়ে
অন্য গাল বাড়িয়ে দেবো না। কিম্বা কখনো বলবো না
অনিচ্ছুক কাউকে বাড়িয়ে দিতে অন্য গালটিও॥

মালপানি জিন্দাবাদ

আজ রাতে সে তার চুলের গুচ্ছ
ছড়িয়েছে ঐ লোকটার
বিছানো বালিশে ;
ব্যাটাচ্ছেলে ওকে কালো-টাকায় কিনেছে।
একদিন ঐ শালাকে আমি দেখে নেবো,
ঐ শুয়োরের বাচ্চাকে আমি ঠিক দেখে নেবো।

আজ থেকে মালপানি জিন্দাবাদ,
আজ থেকে আর ভালোমানুষ থাকবো না ;
আমি শালা সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে টাকাই কামাবো,
দিলটা পাথর ক'রে দিনরাত শুধু মালপানি-ই কামাবো।
ঐ শুয়োরের বাচ্চাকে আমি একদিন
দেখে নেবো, ঠিক দেখে নেবো।

সোনালী কাঁকড়ার দাঁড়া

সোনালি কাঁকড়ার তীক্ষ্ণ দাঁড়া ঘিরে বইছে সময়,
অনুপলে তাকে মাপা মানুষের সাধ্যের অতীত ;
মানুষের ভিতরের উষ্ণ ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে
ভূমিকম্পে-ভূমিধসে ভেঙে যায় সাজানো সংসার।
রূপালি ইলিশগুলি জল থেকে উঠে আসে জালে।
সোনালি শস্যের ক্ষেতে এসে পড়ে অবিরাম
ভারী কামানোর গোলা, শস্যের বদলে ধুলো ওড়ে।

তোমার ভিতর থেকে তুলে আনি রঙিন রুমাল ;
মানুষের মধ্যে দেখি মানুষেরই মতন মানুষ।

আধা-অন্ধকার আর পরাবাস্তবিক অন্ধকার
ভেদ ক'রে সোনালি কাঁকড়ার দাঁড়া খাড়া হয়ে থাকে।

প্রতিদ্বন্দ্বী

সময়, তোমার সময় আছে নাকি ?
দাঁড়াও একটু আমার করিডোরে,
ঘরের ভেতর বন্দী আছি—থাকি
তোমার মুখ দেখবো কাল ভোরে।

সময়, তোমার বন্ধ করো ঘড়ি
বন্দী জীবন ধন্য করে মরি।

জাগরণে ঘোড়াশালে

মধ্যরাত ভেদ করে, অন্ধকারে ট্রেন থামে এই
ছোট্ট কিন্তু স্পষ্ট জরুরি স্টেশনে : ঘোড়াশালে !
সবুজ আধারে প্রিয় শব্দে বেজে চলে দূরাগত

ধ্বনির বিন্যাস ; চমৎকার স্থির জলে মানুষের
সমূহ সম্পদ ভাসে, দোলে মৃদু স্রোতে বা বাতাসে,
ধূসর ডাঙ্গার পটে জেগে ওঠে বিন্যস্তবাগান।

মুহূর্তে বদলে যায় মানুষের চেনা ঘরবাড়ি :
ভূমধ্য সমুদ্রগামী জাহাজের আচরণবিধি
শিখে ফেলে, চারিদিকে, দ্রুত সমতলবাসী সব
গৃহস্থ মানুষ চটপট সাহসী নাবিক বনে।
হার্দ্য জাগরণ আর নীরব বিদ্রোহ থেকে ক্রমে
নীল নিকারির মতো শক্তউরু মানুষ জন্মায় ;
আলস্য-মধুর ঘুমে থেকে আপন স্বার্থের ঊর্ধ্বে
ওঠার সাহস পায়, রাতারাতি, অবলীলাক্রমে,
প্রতিকূল ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জেগে ওঠে নিকারি-জীবন।

এইভাবে মানুষের জীবনের জন্যে ঘোড়াশাল
বড়বেশি সহায়ক হতে পারে, হতে তো দেখেছি।
চোখের গভীর ঘুমে, ঘুমঘোরে, ঘোড়াশালে
পতাকার অনিবার্য প্রকৃত উত্থান। এই ছোট্ট
ঘোড়াশাল ফ্ল্যাগে কেন দৃষ্টি-কালো বৃষ্টির ভিতরে
জেগে ওঠে মানবিক বিপ্লবের প্রথম সোপান ?

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বিভাব সম্পাদক সমীপে,

'রবীন্দ্রনাথ, রেনেসাঁস ও জীবনজিজ্ঞাসা' সম্পর্কে দুচার কথা—

শিবনারায়ণবাবু বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত, পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করা তাঁর কাজ, সুতরাং তাঁর ভাষণটি সংলগ্ন দৃঢ়বদ্ধ অতিকথন দোষ-মুক্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাঁর জ্ঞানত বিশ্বভারতীর মত বিদ্যালয় পৃথিবীর কোথাও নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! বাহবা! চমৎকার!! আমাদের অনেক কিছুকেই এই রকম বিদেশী আলোতে তুলে ধরে অনেকেই সম্মানিত করেছেন—তাতে যেমন আমরা আগে ধন্য হয়েছি তেমনি আবার হওয়া গেল।

তবে প্রবন্ধটি পড়ে আমি বুঝে উঠতে পারলাম না শিবনারায়ণবাবু ছাত্রদের ঠিক কী বলতে চান। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতের তপোবনবাসী কোনো দীক্ষাগুরুর 'সত্যজ্ঞান'কে বিনা বিচারে গ্রহণ করেছিলেন তা মনে হয় না! তাঁর চিন্তার জগতে উপনিষদের স্থান ছিল, কিন্তু সেই উপনিষদ তাঁর চিন্তায় ধ্যানে উপলব্ধিতে সত্য হয়েই ছিল। বিনা বিচারে ছিল না।

শিবনারায়ণবাবুর বক্তব্যে এমন মনে করা অসঙ্গত নয় যে, তিনি পশ্চিমী শিক্ষাকে অনেক উচ্চ স্থান দিচ্ছেন। অদম্য কৌতূহল এবং অক্লান্ত অনুসন্ধান বিজ্ঞানের এবং সমাজ জীবনের বিকাশের মূলসূত্র একথা যদি না মানি তাহলে কী দাঁড়ায়? জীবন ও জীবনবোধ ত একটাই নয়? পশ্চিমের হতাশা নেশাগ্রস্ত আত্মহত্যায় নিমগ্নতা দেখে যদি সংশয় আসে তাহলে এই প্রবীণ জিজ্ঞাসু কী সমাধান খুঁজে পান? কারণ এই হতাশা সেই চরম জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানচর্চা আরোহী প্রক্রিয়ারই ফল মনে করলে কি খুব অন্যায়

হবে? আর সেই পশ্চিমী জিজ্ঞাসুরা সে সব অসম্ভব অমানবিক কাজে লিপ্ত হচ্ছেন সেতো শিবনারায়ণবাবুর মতো তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর অজানা নেই। **'বিশ্বাস'** কি এর চাইতেও খারাপ?

শিবনারায়ণবাবুকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে: নিরন্তর জিজ্ঞাসাও কি মানুষকে নৈষ্কর্ম্যের পথে নিয়ে যায় না? অতি জিজ্ঞাসু কিন্তু চরম সংশয়বাদী এবং সংশয়ী কোনো কাজই করতে পারেন না। অবশ্য নিরন্তর ভাষণ দান একটি মস্তবড় কর্মযজ্ঞ বটে! বাক্‌পটু এই সব বুদ্ধিজীবী কর্মযোগীদের দেখে আজকের নবীনরা যদি মনে করেন যে, দেশ-বিদেশে জ্ঞান-বিতরণ (?) এবং সুখে কালযাপন করাই চরম কর্মযোগ তাহলে কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। এবং এই ভাবাদর্শের কাছে কী প্রাচীন ভারতের তপোবন কী রবীন্দ্রনাথের গভীর ঐতিহ্য-অনুরাগ অথবা গান্ধীজির সত্যানুরাগ কিছুতেই কিছু এসে যায় না। পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার বলতে এই প্রবীণ জিজ্ঞাসু কী বোঝেন? আমরা ত স্পষ্ট দেখাই যে জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানের চর্চা আরোহী প্রক্রিয়া ইত্যাদি যাই বলি না কেন—আশু ধনলাভই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং শিক্ষাকে প্রকৃত ফলপ্রসূ করা যায় কীভাবে? আমার ত মনে হয় দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মধ্যে এই আশ্চর্য পশ্চিমী শিক্ষা প্রসার লাভ করেনি বলে এখনো দেশ কোথাও কোথাও টিকে আছে।

শিবনারায়ণবাবু কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সকলকেই এক আসনে বসিয়েছেন এবং বাঙালীর চিন্তাজগৎকে আচ্ছন্ন করেছেন বলে একই দোষে অভিযুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে কিছু বলা বা বিতর্কে নামা অর্থহীন। বিবেকানন্দ যে জ্ঞানের চর্চায় জিজ্ঞাসা এবং আরোহী প্রক্রিয়াকে তুচ্ছ করেছিলেন এমন প্রমাণ তিনি কোথায় পেলেন?

'বিশ্বাস' কি খুব খারাপ ব্যাপার? পশ্চিমী শিক্ষার আলোতে মাথা পরিষ্কার হবার আগে ভারতীয় প্রাচীন বিশ্বাসে বিশ্বাসীরাই কিন্তু আশ্চর্য সাহিত্য ও চরিত্র তৈরি করেছেন। পশ্চিমের জ্ঞানদায়ী বাতাস গায়ে লাগার আগেই এই বিশ্বাস থেকেই চাঁদ সদাগর বা গোর্খনাথের মত চরিত্রবান মহৎ চরিত্র তৈরি হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের মতো সমাজ সচেতন উপন্যাস রচিত হয়েছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

এতটা লেখার পর খেয়াল হল, এই বক্তৃতাটি শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের

বালক বালিকাদের জন্য ছিল [শিবনারায়ণবাবু একই ধরনের বক্তৃতা কিছু শব্দ বা বাক্য অদল বদল করে ক্রমাগত কেন যত্র তত্র দিয়ে যান কে জানে]। বড় কৌতুক বোধ হল। যদিও শান্তিনিকেতন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির তৈরী, ওখানে বাংলা পঠন-পাঠন অন্য জায়গার চাইতে নিশ্চয় অনেক উচ্চস্তরের, তবু এত কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ, ততোধিক কঠিন বিভ্রান্তকারী বক্তব্য বালকবালিকারা মর্ম গ্রহণ করে কীভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন কে জানে! [হয়ত এঁরা সকলে জিজ্ঞাসু হয়ে বঙ্গীয় শব্দকোষ খুলে দেখেছেন, বলা যায় না।] কিন্তু শিবনারায়ণবাবুর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি এই সামান্য ব্যাপারটা খেয়াল করলেন না! পাণ্ডিত্যের ভার সত্যিই কি গুরু। অথচ বিদ্যাসাগর কী করে যে বর্ণ-পরিচয় লিখেছিলেন সেটাই আশ্চর্য!

নমস্কার।

রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯

সবিনয় নিবেদন,

কিছুদিন আগে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত 'দূরত্ব' নামক চলচ্চিত্রটি দেখেছিলাম একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে। দেখার পর যে মানসিক প্রক্রিয়া, তারই ফলশ্রুতি এই চিঠি।

ব্রহ্মাণ্ডের একটি সাধারণ ধর্মই—দূরত্ব। বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব এবং পৃথক পৃথক ভাবে একই বস্তুর বিভিন্ন সাংগঠনিক উপাদানের অভ্যন্তরীণ দূরত্ব। দৃঢ়তম সংসক্ত যে-কোনো আপাতজড় এককের পরমাণুসমূহের মধ্যেও সতত ক্রিয়াশীল অগণিত দূরত্বের অলক্ষ্য বৃত্ত। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে নিখিল বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিধৃতি এই অমোঘ নিরপেক্ষ দূরত্ব।

কিন্তু মানুষ? শুধুমাত্র বস্তুময় দেহ নয়, চেতনাময় মানসিকতায় আলব্ধ উপলব্ধি—কোটি কোটি চৈতন্যের কোষে কোটি কোটি অভিঘাত, অবিরত সঞ্চরমান এবং পরিবর্তনশীল, স্থান এবং কালের সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশের প্রগতিতে যা ক্রমশই দূরত্বে বিলীন। মহাবিশ্বের জড়তার সর্বব্যাপী দূরত্বের আছে গাণিতিক

পরিমিতি; কিন্তু মানব-চেতনার অন্তর্নিহিত তথা পারস্পরিক দূরত্বে অগণিত অপরিমিতির নানা রঙের খেলা। সে খেলায় একক মানুষ ক্ষণে ক্ষণে পালটায়, সময়ের সূক্ষ্মতম ব্যবধানে শতধাসত্তার বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশগুলির মধ্যে এক অপার দূরত্ব রচনা করে; আবার কখন যেন সংসক্তির প্রক্রিয়ায় সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে নতুন কোনো এক অবস্থান থেকে শুরু করে। সেই একক সমসাময়িক মানুষ যখন অনুরূপ ভাঙচুরধর্মী অন্য এক বা একাধিক এককের মুখোমুখি হয়, তখন আকর্ষণ-বিকর্ষণের পারমুটেশন কমবিনেশনের অসংখ্য প্রতিক্রিয়ায় যে অস্থির দূরত্বের সৃষ্টি হয়, ব্যষ্টির ক্ষেত্রে তার নাম সংসার, সমষ্টির ক্ষেত্রে সমাজ।

এই সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী দূরত্ব-আবর্তে আমাদের আনাগোনা। হয়তো মূলে বহিঃকেন্দ্রিক কোনো ঘটনা থাকে, কিন্তু মানসিকতায় সেই ঘটনার রাসায়নিক বিজারণ একবার সুরু হয়ে গেলে ঘটনা পরম্পরা আপনিই ঘটতে থাকে, যাদের বিজারণে আবার নতুন নতুন ঘটনা জন্ম নেয়। পারমাণবিক রিঅ্যাকটরের মতে—পরিণতিতে যার স্বাভাবিক প্রবণতা বিস্ফোরণে, কিন্তু অস্তিত্বের স্তর বজায় রাখার মানবিক তাগিদে আত্মপরিধির মধ্যেই রক্ষাকবচ তৈরি করে নেয়, ফলে ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ফোরণ কদাচিৎ ঘটলেও সাধারণভাবে একটি নতুন ভরকেন্দ্রের সৃষ্টি হয় মাত্র, যেখান থেকে পুনরায় যাত্রা করে আবার একটি নতুন ভরকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এমনিভাবে চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আকাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্য অনধিগত থেকে যায়, আশংকিত বিস্ফোরণ হয়ে যায় অঘটনা।

চলতে চলতে কিছু কিছু তীব্র অথচ পেলব এবং সরাসরি আবেদনে রোমাঞ্চিত হতে হয়—যেমন, 'বুরী নজরওয়ালে তেরা মুহ্ কালা' কিংবা 'দেখো, মগর প্যার সে' অথবা 'পথের বন্ধু, মনে রেখো, আবার আসব' ইত্যাদি। কার আবেদন, কোথায় আবেদন?

এই একদিকে, অন্য দিকে একটি বিরল চলন্ত ঘোষণা :—

'গাড়ি শুধু গাড়ি নয় ভালোবাসার ফুল
ঠিকমত বোঝাই কর, কোরো নাকো ভুল।'

মন্তব্য সংরক্ষিত। মনে হয় একটি আন্তর্জাতিক গাড়িবর্ষের আশু প্রয়োজন।

দূরত্ব বিষয়ক উপরোক্ত মন্তব্য সমূহ কোনো বিশেষ নিবন্ধের ভূমিকা-প্রচেষ্টা নয়, কিছু তাৎক্ষণিক ভাবনার ফসল। এই ভাবনার উৎসে আছে একটি

চলচ্চিত্র—নাম 'দূরত্ব'। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীসূত্র অবলম্বন করে চিত্র-অবয়ব দান করেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। চলচ্চিত্রটি এখনও ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তিলাভ করেনি, কবে করবে এখনো অনিশ্চিত, সে কারণে চলচ্চিত্র হিসাবে এর বিস্তৃত আলোচনায় আপাতত বিরত থাকলাম। ভাললাগাসঞ্জাত আপাত-অসংলগ্ন দার্শনিক ভাবনাগুলো একান্তভাবে আমার নিজস্ব এবং হয়তো এমনও হতে পারে যে, পুরোপুরি চলচ্চিত্রানুসারী নয়। তবু চিত্রটি একবার দর্শনেই যে ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তার যথেচ্ছ পল্লবায়ন এই লেখাটি।

ইতি—
আদিনাথ ভট্টাচার্য
নিউ আলিপুর। কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদের কয়েকটি প্রকাশনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান		
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২য় সংস্করণ)	/ ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী	/ ১৬·০০
সমাজতন্ত্র (২য় সংস্করণ)	/ শ্রীপরিমলভূষণ কর	/ ১৫·০০
ভারতের শাসনব্যবস্থা	/ শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য	/ ২০·০০
গণরাজ্য (প্লেটোজ রিপাব্লিক)	/ শ্রীসুধাকান্ত দে	/ ১৪·০০
এ্যারিষ্টটলের পলিটিক্স	/ শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার	/ ১৪·০০
বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা (যুক্তরাজ্য * সোভিয়েট ইউনিয়ন)	/ শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষাল	/ ১৫·০০
রাষ্ট্রসংঘ	/ শ্রীশেখর ঘোষ	/ ১২·০০
চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাজনীতি ও সংবিধান	/ ডঃ স্নেহময় চাকলাদার	/ ১১·০০
রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস	/ শ্রীনির্মলকুমার সেন	/ ১২·০০
অর্থনীতি		
সংখ্যাতত্ত্ব	/ ডঃ রাজকুমার সেন	/ ২১·০০
রাশিবিজ্ঞান		
রাশিবিজ্ঞানের পরিভাষা	/ শ্রীবিশ্বনাথ দাস শ্রীভাগবত দাসগুপ্ত শ্রীঅরিজিৎ চৌধুরী	/ ১·৫০
রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধতি	/ ডঃ ব্রজেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা শ্রীভাগবত দাসগুপ্ত শ্রীবাসুদেব অধিকারী	/ ১৭·০০
রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)	/ শ্রীশৈলেশভূষণ চৌধুরী শ্রীঅরিজিৎ চৌধুরী শ্রীবিশ্বনাথ দাস	/ ১৬·০০
রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (দ্বিতীয় খণ্ড)	/ ঐ	/ ১৬·০০

কার্যালয় : ৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩

BIVAV

Price Rs. 3.00 | April—June 1979 | RN 30017/76

Vol. 3 No. 4 | Published in August '79

A colourful name in printing

- For excellent four colour half-tone reproductions, EMMO zinc plates have an unmatched reputation in the blockmaking industry
- Fully quality controlled and tested for microscopic and other defects.
- EMMO zinc plates prove to be more economical than imported copper plates.
- EMMO zinc plates are available whenever and wherever you want them through Union Carbide's wide distribution channels.

EMMO zinc plates—the 1st choice of leading blockmakers.

UNION CARBIDE NOW ADDS
POWDERLESS ETCHING PLATES

For details contact:

UNION CARBIDE

UNION CARBIDE INDIA LIMITED

Registered Office 1 Middleton Street. Calcutta 700016 Tel 44-8391

P.O. Box 301 AHMEDABAD-1	P.O. Box 486 CALCUTTA-1	Silver Oak Compound Napier Town JABALPUR	XXXV/1208 'Advaita' Ravipuram Rd. COCHIN-16	P.O. Box 353 MADRAS-2
P.O. Box 59 BOMBAY-1	Silpukhuri 9, GAUHATI-3	10 Narain Singh Rd. JAIPUR-4	P.O. Box 99 LUCKNOW	P.O. Box 1675 SECUNDERABAD
	P.O. Box 417 NEW DELHI-1	P.O. Box 94 PATNA-1	Mysore Rd BANGALORE-39	